দারসে কুরআন সিরিজ - ১৩

ইসলামি জীবন দর্শন

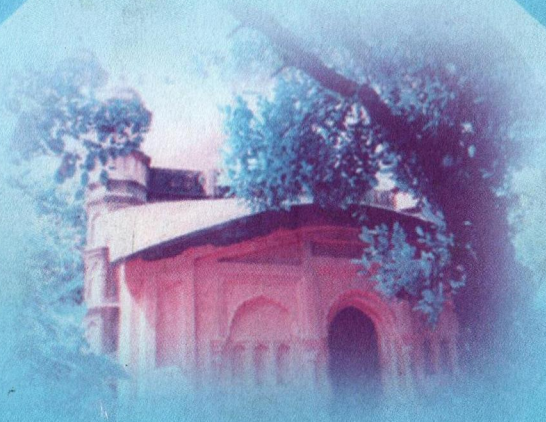

খন্দকার আবুল খায়ের

দারসে কুরআন সিরিজ–১৩

ইসলামী জীবন দর্শন

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী

বুকস্ অ্যান্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)

৩৮/৩, বাংলাবাজার ঢাকা–১১০০

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন দর্শন

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

খন্দকার প্রকাশনী

বুকস্ অ্যান্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)

৩৮/৩, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১২২০৪৭ (অনুরোধে), মোবাইল ঃ ০১৭১-৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ ঃ জুলাই-১৯৮২

পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুলাই-২০০৫

পনেরতম প্রকাশ ঃ নভেম্বর- ২০০৯ ইং

প্রচ্ছদ

আনোয়ার হোসেন

বর্ণবিন্যাস

আল-আমিন কম্পিউটার

বুকস্ অ্যান্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)

৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৮৯-৮৭৩১৯৭

ভ্রম সংশোধন

মোশাররফ হোসাইন সাগর

মুদ্রণ

আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস

৩৬, শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচীক্রম

০১.	ইসলামী জীবন দর্শন	০৫
০২.	জীবন পরিচিতি	০৬
০৩.	মানব মনের মৌলিক প্রশ্ন	০৯
০৪.	জ্ঞান কি ও কত প্রকার	১৩
০৫.	মগজে জ্ঞান সঞ্চয়ের ধরন	১৫
০৬.	শিক্ষার কাজ	১৬
০৭.	ইসলামী শিক্ষা	১৮
০৮.	ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি	১৮
০৯.	বর্তমান শিক্ষার ধরন ও ফলাফল	২০
১০.	বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের যা শেখায় তার ধরন	২০
১১.	মনের উপর শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব	২১
১২.	বিজ্ঞান কি ইসলামবিরোধী	২২
১৩.	ইসলামী ও গায়ের ইসলামীর পার্থক্য	২২
১৪.	মানব মনের হিসাব	২৪
১৫.	অর্থের ব্যাপারে ঈমানদারী	২৮
১৬.	জীবন বিধান	২৯
১৭.	মানব রচিত জীবন বিধান	৩৭
১৮.	আল্লাহর দৃষ্টিতে মানব জীবন	৩৯
১৯.	মনের পরিচয়	৪২
২০.	জাতীয় আদর্শের অনুপস্থিতিতে মনের অবস্থা	৪৩
২১.	রাসূল (সা)-এর সম্পর্কে আমাদের ধারণা	৪৪
২২.	ইসলামী আইন	৫১
২৩.	সংস্কৃতি	৫১
২৪.	তাসাউফ ও রাজনীতি	৫৩
২৫.	উপসংহার	৫৪

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

* যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
* যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
* যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
* যারা আরবী ভাষা জানেন না অথচ কুরআন বুঝতে চান।
* যারা তাফসীর মাহফিলে শরীক হওয়ার সুযোগ পান না।
* যারা খতীব বা মুবাল্লীগ হিসেব যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য

* ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
* সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ।
* সহজবোধ্য ভাষায় অখণ্ডনীয় যুক্তি।
* নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

* দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার করা।
* লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী জীবন দর্শন

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ *

অর্থ ঃ তিনি (সেই আল্লাহ) যিনি তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন 'আল হুদা' ও 'দ্বীনিল হক' সহকারে। যেন তিনি সেই দ্বীনিল হককে সকল প্রকার বাতিল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকগণ তা পছন্দ করবে না। (সূরা সাফ ঃ ৯)

শব্দার্থ ঃ هُوَ – তিনি। الَّذِىْ – যিনি। اَرْسَلَ – পাঠিয়েছেন। رَسُوْلَهٗ – তার রাসূলকে। بِالْهُدٰى – হুদা সহকারে (হুদার বাংলা অর্থ পরে আসছে)। وَدِيْنِ الْحَقِّ – এবং সত্য বা সঠিক জীবনব্যবস্থা। لِ – যেন বা এই জন্য যে। يُظْهِرَهٗ – তাকে বিজয়ী করতে পারেন। عَلَى – উপরে। الدِّيْنِ – জীবন ব্যবস্থাসমূহ। كُلِّهٖ – সকল প্রকার। وَلَوْ – এবং যদিও। كَرِهَ – অপছন্দ করে। الْمُشْرِكُوْنَ – মুশরিকগণ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আল্লাহপাক রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাঁর রাসূলকে দুটো জিনিস সহকারে পাঠিয়েছেন, তার একটা হলো 'আল হুদা'–যার অর্থ তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে 'আল ইলমুন নাফে' অর্থাৎ কল্যাণকর জ্ঞান বা জীবন জিজ্ঞাসার ইসলামী জবাব বা ইসলামী জীবন দর্শন যার মধ্যে ইসলামী জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। সে জ্ঞানটাই হচ্ছে আল হুদার জ্ঞান। আর তারই ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই সিরিজে।

এরপর বলা হয়েছে, রাসূলকে পাঠানো হয়েছে আরেকটি জিনিস সহকারে, তা হচ্ছে 'দ্বীনিল হক' বা সঠিক জীবনব্যবস্থা। যা মুশরিকরা

www.pathagar.com

পছন্দ করবে না। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যারাই মুশরিক তারাই আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা অপছন্দ করে। আর যারাই আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা অপছন্দ করে এবং এর বিরোধিতা করে তারাই মুশরিকদের দলভুক্ত।

এরপরও লক্ষণীয় যে, যারাই ইসলামী জীবনব্যবস্থা অপছন্দ করে তারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো জীবনব্যবস্থা পছন্দ করে। সেটা কোনটা? সেটাই হচ্ছে কুফরী জীবনব্যবস্থা এবং সেটাকে উৎখাত করে সেখানে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে রাসূল (সা)-কে। আর সেই নির্দেশ পালন করতে গিয়েই রাসূল (সা) ২৩ বছর ধরে একটানা জিহাদ করলেন। তাঁকে হিজরত করতে হলো, শত শত সাহাবীর রক্ত ঝরাতে হলো। অতঃপর শহীদানদের তাজা রক্তের ফাউন্ডেশনের উপর কায়েম হলো ইসলামী হুকুমাত যেখানে পূর্ণভাবে চালু হলো ইসলামী জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থার ব্যাখ্যা দারসে কুরআন সিরিজের ৩ নম্বর পুস্তিকায় দেয়া হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র জীবন জিজ্ঞাসার জবাব ও ইসলামী জীবন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা বা জ্ঞান দানে চেষ্টা করা হয়েছে–যা শিক্ষা দেয় 'আল হুদা'।

এবার আসুন আমরা প্রথমে জীবনব্যবস্থার ইসলামী ধারণাটা আরো সুস্পষ্ট করতে চেষ্টা করি।

জীবন পরিচিতি

'জীব' যে শক্তিবলে 'জীবিত' ঐ শক্তির নামই 'জীবন'। জীবন দুই প্রকার, যথা ঃ ১. বাকশক্তিসম্পন্ন জীবন–এই জীবন মানুষের, এবং ২. বাকশক্তিহীন জীবন–এই জীবন অন্যান্য প্রাণীর। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে একটা জীবন যার আরবী নাম رَوَانْ (রাওয়ান)। এ জীবনে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু জ্ঞান ও বিচারবোধ নেই।

আর মানুষের জীবন দুইটি, একটির নাম رَوَانْ (রাওয়ান), অন্যটির নাম رُوْح (রূহ)। এই রূহর মধ্যেই রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনাশক্তি। মানুষের মস্তিষ্কে সর্বদা কোনো না কোনো চিন্তা থাকেই। এই চিন্তাশক্তি রূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

চিন্তায় মস্তিষ্কের পরিশ্রম হয়, তাই মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য ঘুমের ব্যবস্থা রয়েছে মানুষের জন্য। অন্যান্য প্রাণীর যেহেতু চিন্তাশক্তি নেই তাই তাদের ঘুমেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য প্রাণীর যা ঘুম তা হচ্ছে তন্দ্রা মাত্র। মানুষের মতো গভীর নিদ্রা কোনো প্রাণীরই নেই। তারা যেদিন ঘুমাবে সেদিন-ই মরবে। সে ঘুম থেকে তারা আর জাগবে না।

কারো বাড়িতে চোর আসলে এবং সে বাড়িতে কুকুর থাকলে তাকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে হয় না, এমনিতেই সে জেগে যায়। কোনো একটা গরুকেও গোয়ালে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হয় না।

যারা বদ্ধপাগল, যাদের চিন্তাশক্তি রহিত হয়ে গেছে–তারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঘুমের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

মানুষের জ্ঞান আছে বলেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের জন্য বাকশক্তি আছে। যাদের জ্ঞান নেই তাদের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের কোনো প্রশ্ন নেই, তাই তাদের বাকশক্তিও নেই।

অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যেহেতু কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ নেই, আর যেহেতু মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আছে, তাই মানুষের বিচার হবে। শেষ বিচারে নির্দোষী হলে তার জন্য চিরশান্তির স্থান বেহেশত রয়েছে, আর দোষী হলে তার জন্য চিরশাস্তির স্থান জাহান্নাম রয়েছে।

বলা হয়, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাণীর জীবন-ই অর্থাৎ رَوَانْ-বিশিষ্ট জীবন-ই ক্ষণস্থায়ী। যাদের জীবনে رُوْح (রূহ) আছে, তাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী নয়, তাদের জীবন চিরস্থায়ী।

তবে হ্যাঁ, এ জীবনের কতকগুলো স্তর আছে। তার কোনো এক স্তরে জীবনের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু পরে পুনরায় সেই জীবনই উত্থিত হবে। তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে এমন, যেমন মানুষ গভীর নিদ্রা গেলে কিছু সময়ের খবর সে বলতে পারে না, কিন্তু সে বোঝে যে, আমি ঘুমের পূর্বেও যে ছিলাম ঘুম থেকে জাগার পরেও সেই মানুষই রয়েছি। ঠিক তেমনি হাশরের মাঠে মানুষ পুনরুত্থিত হয়ে বুঝবে যে, আমি যে মানুষ পৃথিবীতে ছিলাম এখনো সেই মানুষই আছি।

মানুষের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা দেখা যায় না, এমন প্রত্যেকটি জিনিস-ই মানুষের মৃত্যুর পর থাকবে। আর যা দেখা যায়, মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

সেগুলো আর থাকবে না। আর থাকবে না দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্যাবলী, যেমন পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি মৃত্যুর পর থাকবে না। কিন্তু বিবেক, জ্ঞান-বুদ্ধি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, অনুভূতি, দয়া-মায়া ইত্যাদি গুণ যা অদৃশ্যমান শক্তি তা মৃত্যুর পরও থাকবে।

মানুষ কোনো গাড়িতে করে কিছুক্ষণ ভ্রমণের পরে গাড়ি থেকে যখন নেমে যায় তখন যেমন সে দেখে যে, এই গাড়িতে আমি এতক্ষণ ছিলাম, এখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছি, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরে মানুষ তার দেহকে দেখে মনে মনে বুঝবে যে, এই মৃতদেহটির মধ্যে আমি এতদিন ছিলাম, এখন এ বাহন ছেড়ে আমি অন্যত্র চলে যাচ্ছি।

অতঃপর এ জীবনই এক ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করবে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত। তারপর হবে শেষ বিচার। বিচারের পর মানুষ অনন্তকাল পর্যন্ত যার যার পরিণাম ফল ভোগ করতে থাকবে।

যারা আল্লাহবিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে পরকাল হবেই। এ বিশ্বাসটা এমন হতে হবে যেমন আমরা বিশ্বাস করি রাতের পর দিন আছে এবং দিনের পরে রাত আছে। এ বিশ্বাসে যেমন কোনো সন্দেহ নেই তেমনি পরকাল হবেই এতেও কোনো সন্দেহ নেই। জীবনের এটাই যখন বাস্তব অবস্থা তখন শুধু জীবনের বিচারে মানব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করা চলে না। মানব জীবন চিরস্থায়ী। তাই মানব জীবন নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করতে হলে শুধু পৃথিবীর জীবন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে চলবে না। চিন্তা করতে হবে পার্থিব জীবনের কার্যকলাপ থেকে শুরু করে পরকালের শেষ বিচার পর্যন্ত ও বিচারশেষে পরিণাম ও পরিণতি ভোগের সেই অনন্তকালকে একসঙ্গে ধরেই।

মানব জীবনের বিরাট একটা অংশকে বাদ দিয়ে যারা শুধু ছোট গণ্ডিবদ্ধ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যকার জীবনের ক্ষুদ্র একটা অংশকে পুরো জীবন মনে করে জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তারা হয়তো বে-ঈমান অথবা অধম বোকা।

তাদের কথা আল্লাহ বলেছেন ঃ فَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অর্থ ঃ তারা যে বোঝে না সে বিষয়েও তারা অজ্ঞ।

www.pathagar.com

মানব মনের মৌলিক প্রশ্ন

মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের মনে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নগুলোর সঠিক ও নির্ভুল জবাব যে মানুষের মগজে নেই তাদের জীবনযাপন এবং লক্ষ্যহীন পথচারীর পথচলার মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। নৌকার মাঝিকে যেমন নৌকা ছাড়ার পূর্বে জানতে হয় যে, সে নৌকা বেয়ে কোন ঘাটে পৌছবে। তেমনি প্রত্যেকটি পথিক যখন সে পথ চলে তখন তাকে অবশ্যই জানতে হয় যে, তাকে কোথায় যেতে হবে। ঠিক তেমনি একটা মানুষকেও জানতে হবে যে, তার জীবনের লক্ষ্য কি? লক্ষ্য ঠিক করতে যারা ব্যর্থ তাদের জীবনই ব্যর্থ। মানুষের চিরন্তন প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. এ বিশ্বের কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে কি? থাকলে তাঁর পরিচয় কি?

২. মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

৩. মানবের আর্দশ জীবন বিধান কি?

৪. সমাজবদ্ধ জীব মানব জাতির আদর্শ নেতা কে?

৫. জীবনের শেষ পরিণতি কি?

এ প্রশ্নক'টির জবাব যে যেমনভাবে গ্রহণ করবে তার জীবন তেমনভাবে গড়ে তুলবে।

এ প্রশ্নগুলির জবাব দুই প্রকার হতে পারে ঃ ক) আল্লাহকে স্বীকার করার ভিত্তিতে। খ) আল্লাহকে অস্বীকার করার ভিত্তিতে।

ক) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের জবাব হলো ঃ

১. এ বিশ্বের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।

২. জীবনের চরম লক্ষ্য শান্তি লাভ করা।

৩. যে বিধান মেনে চললে জীবনে সুখ-শান্তি আসবে।

৪. পার্থিব জীবনে লাভবান হওয়ার মতো পথ যিনি দেখাতে পারবেন তিনি আদর্শ নেতা।

৫. মৃত্যু পর্যন্তই জীবন। এরপর আর কোনো কিছু নেই।

www.pathagar.com

প্রথম প্রশ্নের উত্তর 'না'-সূচক হলে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর জবাব সেই মোতাবিক হতে বাধ্য।

খ) যারা আল্লাহকে স্বীকার করে তাদের জবাব হলো ঃ

১. هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি আল্লাহ। তার কোনো শরীক নেই। তিনি সর্বশক্তিমান ইত্যাদি।

আল্লাহকে স্বীকার করলে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর জবাব হবে নিম্নরূপ ঃ

২. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ ঃ আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার দাসত্ব ছাড়া অন্যকোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।

তাই আল্লাহর দাসত্ব করা ছাড়া মানব জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহর-ই হুকুম মেনে চলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করাই মূল লক্ষ্য। আল্লাহ যার কাজে খুশি তারই জীবন সফল হলো। আর যার কাজে আল্লাহ নারাজ তারই জীবন ব্যর্থ হলো।

৩. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ ঃ আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

তাই রাসূল (সা)-এর জীবনীর মধ্যেই রয়েছে আমাদের আদর্শ জীবন বিধান।

৪. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ খোদাভীরু লোকদের নেতা যিনি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।

অতএব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) যিনি আমাদের রাসূল তিনিই আমাদের নেতা।

www.pathagar.com

৫. وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, অতঃপর শেষ বিচারে নির্দোষী সাব্যস্ত হলে জান্নাত মিলবে, না হলে জাহান্নাম।

এরপর আরো ৩টি উপ-প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে ঃ

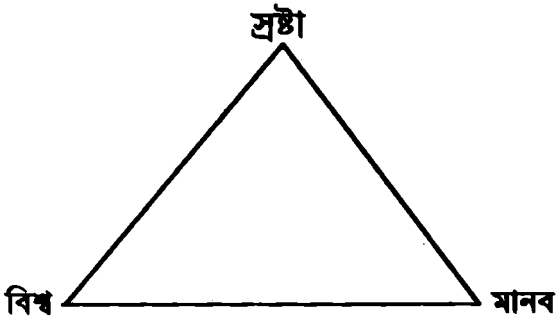

এই তিনটার মধ্যে কোনটার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক অর্থাৎ

১. আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি?

২. মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক কি?

৩. আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক কি?

এর জবাব ঃ

১. رَبِّ النَّاسِ- مَلِكِ النَّاسِ- اِلٰهِ النَّاسِ

অর্থ ঃ আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক ও প্রভু (رَبِّ), আল্লাহ মানুষের বাদশাহ্ (مَلِكْ), আল্লাহ মানুষের আইনদাতা, হুকুমদাতা ও সার্বভৌমত্বের মালিক (اِلٰهْ)।

২. سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

অর্থ ঃ আসমান-জমিনে যা কিছু রয়েছে তা সব-ই মানুষের সেবায় নিয়োজিত।

www.pathagar.com

অর্থাৎ মানুষ ছাড়া আর যত সৃষ্টি, তা সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের প্রয়োজন মিটানো।

৩. رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ ঃ তিনি জগৎসমূহের রব (رَبّ) বা প্রতিপালক।

এ আলোচনায় এতটুকু প্রতীয়মান হলো যে, পিতার সাথে তার সন্তানের সম্পর্ক এবং পিতার সাথে তার ধন-সম্পদের সম্পর্কের ধরন যেমন, আল্লাহর সাথে মানুষের এবং আল্লাহর সাথে আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্কের ধরনও তেমনি।

পিতার যেমন সমস্ত ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি তার সন্তানদের জন্যই, ঠিক তেমনি আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টি মানুষের জন্যই (অবশ্য আমি এখানে আল্লাহকে পিতা বলিনি, এটা মাত্র একটা কাছাকাছি উদাহরণের জন্য ব্যবহার করেছি)।

সন্তান যেমন জ্ঞান হওয়ার পরে দেখে যে, তার জন্য মোটামুটি যা প্রয়োজন তার প্রায় সবই তার পিতার রয়েছে।

তেমনি মানুষ দুনিয়ায় পয়দা হয়ে দেখলো যে, পৃথিবীতে বসবাসের উপযোগী সকল কিছুই পূর্ব হতেই সৃষ্টি হয়ে রয়েছে (আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন)।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুই তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব তারা ঠিকমতোই পালন করে যাচ্ছে। যেমন রাত ও দিন, ঋতুর পরিবর্তন, মৌসুমী ফল ও আবাদ ফসল ঠিকমতোই হচ্ছে। গাছ ফল দিচ্ছে, গাভী দুধ দিচ্ছে, মৌমাছি মধু দিচ্ছে ইত্যাদি।

আল্লাহ যাকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করছেন তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমতোই পালন করে যাচ্ছে।

কিন্তু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছি শুধু আমরা মানুষ জাতি। কারণ জীবন ও জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই অস্পষ্ট। তাই আসুন জ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করি।

www.pathagar.com

জ্ঞান লাভের উৎস

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

পড় সেই প্রভুর নামে যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন

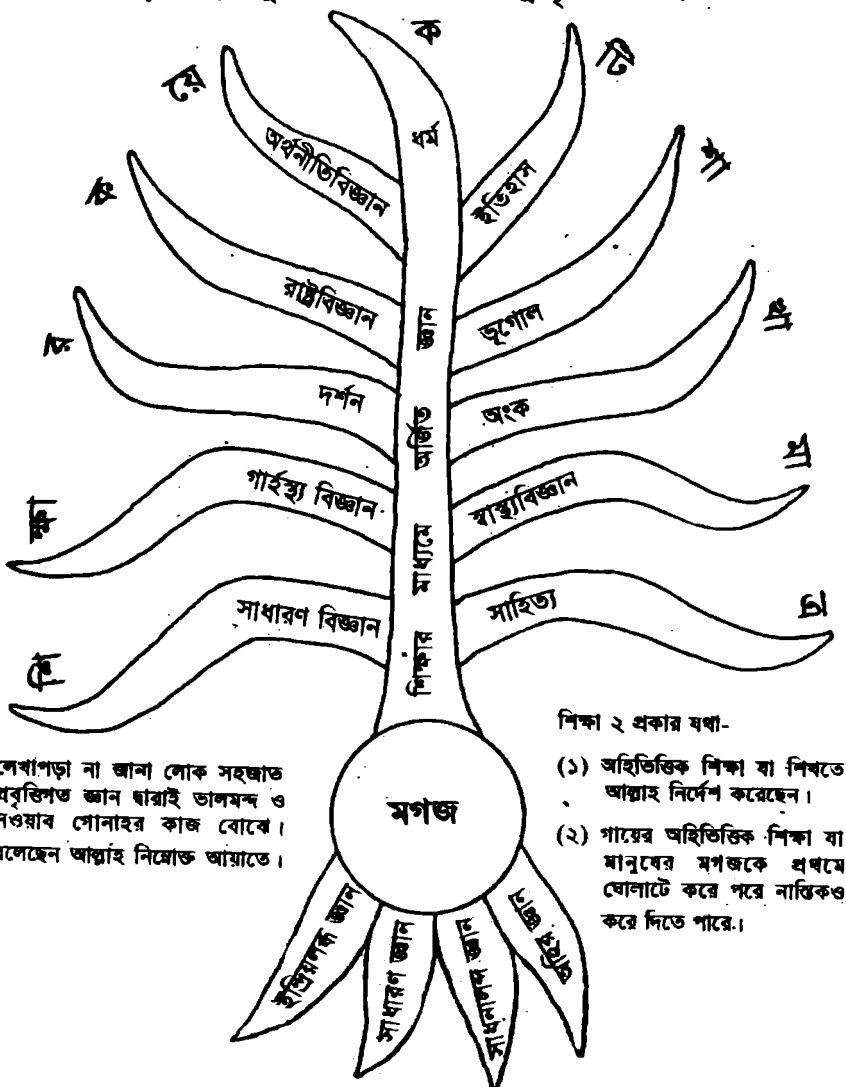

শিক্ষা ২ প্রকার যথা-

(১) অহিতিত্তিক শিক্ষা যা শিখতে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন।

(২) গায়ের অহিতিত্তিক শিক্ষা যা মানুষের মগজকে প্রথমে ঘোলাটে করে পরে নাস্তিকও করে দিতে পারে।

লেখাপড়া না জানা লোক সহজাত প্রবৃত্তিগত জ্ঞান দ্বারাই ভালমন্দ ও সওয়াব গোনাহর কাজ বোঝে। বলেছেন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا

আল্লাহ ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান এলহাম করেছেন

www.pathagar.com

জ্ঞান কি ও কত প্রকার

অত্যন্ত সহজ কথায় জ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছে 'মানুষ যা থেকে প্রশ্ন করে ও যা থেকে সে প্রশ্নের জবাব আসে সেটার নামই 'জ্ঞান'। জ্ঞান ছাড়া প্রশ্ন করা যায় না এবং জ্ঞান ছাড়া জবাবও দেয়া যায় না। এ জ্ঞান দুই প্রকার। যথা ঃ ১. অহীভিত্তিক জ্ঞান। ২. গায়ের অহীভিত্তিক জ্ঞান।

মানুষের মগজে জ্ঞান অর্জিত হয় চারটি রাস্তা ধরে। মানুষ যত প্রকার প্রশ্ন করতে পারে তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হলে তাকে ঐ চারটির যেকোনো একটির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান থেকেই তার জবাব দিতে হয়। এ রাস্তা বা মাধ্যমগুলো হচ্ছে ঃ

১. ইন্দ্রিয়, ২. সাধারণ জ্ঞান, ৩. প্রজ্ঞা ও ৪. অহী।

এ জ্ঞান বৃদ্ধি পায় শিক্ষার মাধ্যমে।

১. যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা গরম না ঠাণ্ডা কিংবা মিঠে না তিতে, তাহলে এ প্রশ্নের জবাব আসবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে। যা পূর্বের ছঁকে দেখানো হয়েছে।

২. যদি প্রশ্ন করা হয়, ২+২= কত হয়? এর জবাব আসবে সাধারণ জ্ঞান থেকে।

৩. যদি প্রশ্ন করা হয়, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একটা বছর পূর্ণ হয়ে যায়, এর দিনটা না হয় সালের গণনা থেকে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু ঘণ্টা, মিনিট সেকেন্ড–এগুলোর হিসাব পাওয়া যায় কোন গণনা অনুযায়ী, তবে এ প্রশ্নের জবাব সাধারণ জ্ঞান থেকেই আসবে না, এর জবাব আসবে প্রজ্ঞা বা সাধনালব্ধ জ্ঞান থেকে।

৪. যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রথম মানুষ কে ছিলেন বা মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থা হবে, তবে এর জবাব আসবে অহীর জ্ঞান থেকে। যেসব প্রশ্নের জবাব অহী ছাড়া অন্যত্র নেই সেসব প্রশ্নের জবাব যদি প্রজ্ঞা থেকে দেয়া হয় তবে তা অবশ্যই ভুল হবে।

এখানে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষণীয় যে, সমাজের যাবতীয় আইন-কানুন তৈরি হয়েছে কোনো না কোনো প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে। যেমন প্রশ্ন করা যায়–

১. চুরি করলে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত?

www.pathagar.com

২. জেনার শাস্তি কি হবে?

৩. কোন অপরাধীর জন্য কি শাস্তি হওয়া উচিত?

৪. ব্যাংক চলবে কোন আইনের ভিত্তিতে?

৫. রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন চলবে কোন মূল নীতির ভিত্তিতে?

৬. মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হতে হবে?

৭. মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হবে কোন ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে?

এই ধরনের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব রয়েছে অহীর মধ্যে। এসব প্রশ্নের জবাব যদি মানুষের নিজের জ্ঞান থেকে দেয়, তবে অবশ্যই সে জবাব ভুল হবে। আর সেই ভুল জবাবের ভিত্তিতে যে আইন তৈরি হবে সে আইনও হবে ভুল। অতঃপর সেই আইনের ভিত্তিতে যে সমাজ পরিচালিত হবে তা অবশ্যই ভুল পথে চলবে। আর ভুল বা গলদ আইনের সমাজে বাস করে কোনো মুসলামানেই মনে করতে পারে না যে 'এ সমাজে আমি পুরো ইসলাম মেনে চলতে পারি।'

এই ধরনের সমাজে গলদ আইনের অধীনে বাস করে যে মুসলমান সেই আইন সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে না সে মুসলমান নিজেকে কোনো যুক্তির ভিত্তিতেই দ্বীনদার বলে দাবি করতে পারেন না। এ ব্যাপারে নবী করিম (সা)-এর নির্দেশ, যখনই কোনো মুসলমান তার সামনে সমাজে কোনো গায়ের ইসলামী (ইসলামের দৃষ্টিতে যা অন্যায়) কাজ হতে দেখবে তখন তার দায়িত্ব হবে সে অন্যায়কে পরিবর্তন করে সেখানে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা–যা এই বইয়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

মগজে জ্ঞান সঞ্চয়ের ধরন

ধরে নিন মগজ একটি পানির ট্যাঙ্ক। এতে চারটি প্রধান পাইপ সংযুক্ত করা হয়েছে। এ পাইপগুলো দিয়ে ট্যাঙ্কে পানি প্রবেশ করে। এ পাইপগুলোর নাম ঃ ১. ইন্দ্রিয়, ২. সাধারণ জ্ঞান, ৩. প্রজ্ঞা বা সাধনালব্ধ জ্ঞান এবং ৪. অহী।

এই পাইপগুলোকে ধরে নিন জ্ঞানার্জনের মাধ্যম, আর পানিকে ধরে নিন জ্ঞান। এ প্রধান পাইপগুলোর সঙ্গে মনে করুন আরো কিছু পরিপূরক পাইপ সংযুক্ত করা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে শিক্ষার বিভিন্ন শাখা। যেটাকে

www.pathagar.com

একটা জ্ঞানবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবার মনে করুন, মগজের সঙ্গে সংযুক্ত করা ১, ২, ও ৩ নং পাইপ দিয়ে স্বচ্ছ পানি ট্যাঙ্কে প্রবেশ করছে আর ৪ নং পাইপ দিয়ে সবুজ রং-এর (যা অহীর প্রতীক) পানি প্রবেশ করছে। এভাবে একটা পাইপ দিয়ে সবুজ পানি ট্যাঙ্কে ঢুকলে ট্যাঙ্কের সমস্ত পানিই সবুজ রং-এর হয়ে যায় অর্থাৎ তার জ্ঞান হয়ে যায় অহীভিত্তিক।

কিন্তু যদি শিক্ষা রূপ পরিপূরক পাইপ দিয়ে মগজে লাল বা কালো রং-এর পানি ঢুকে তাহলে ট্যাঙ্কের পানি ঘোলাটে হয়ে যায় অর্থাৎ আল্লাহহীন ভিত্তিতে জ্ঞান ঢুকতে থাকে। তবে অহীর জ্ঞান যা জন্মের পর হতে পিতা-মাতার নিকট থেকে অর্জন করেছিল তা লাল-কালোর সংমিশ্রণে ঘোলাটে হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি পরিপূরক প্রত্যেকটি পাইপ দিয়ে (অর্থাৎ শিক্ষার প্রতিটি শাখার মাধ্যমে) সবুজ রং-এর পানি মগজে প্রবেশ করতো তবে দেখা যেতো মানুষ যে যত বেশি লেখাপড়া শিখেছে সে তত বেশি আল্লাহভীরু পরহেজগার বান্দাহয় পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা কেন হচ্ছে না তা আশা করি আর কারো বুঝতে বাকি রইলো না।

শিক্ষার কাজ

শিক্ষার কাজ বুঝানোর জন্য আমি সংক্ষেপে একটি উদাহরণ পেশ করছি। ধরে নিন দুটো টর্চলাইটের একটিতে দুর্বল ব্যাটারী অন্যটিতে নতুন ও শক্তিশালী ব্যাটারী। টর্চলাইটদু'টি দেখে টের পাওয়া যায় না যে, কোনটায় কি ধরনের ব্যাটারী রয়েছে। কিন্তু সুইচ টিপলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনটার ব্যাটারীর শক্তি কি পরিমাণ।

একটা মানুষ যখন বিদ্যাহীন তখন তার মেছাল–দুর্বল ব্যাটারীওয়ালা টর্চলাইটের মতো, যার টিমটিমে আলোয় পথ দেখা যায় না। আর বিদ্বান লোকের মেছাল শক্তিশালী ব্যাটারীবিশিষ্ট টর্চলাইটের মতো, যার আলোয় পথের যাবতীয় অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে ব্যাটারী দিয়েছেন, কিন্তু তাতে শিক্ষার মাধ্যমে চার্জ দিয়ে নিতে হয়। এতে যতই চার্জ দেয়া হবে ততই তার শক্তি বাড়তে থাকবে। টর্চের আলো যেমন প্রকৃতিগতভাবেই স্বচ্ছ তেমনি মানুষের বিদ্যালব্ধ জ্ঞানও প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহমুখী।

www.pathagar.com

কিন্তু টর্চলাইটের আলো স্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও যদি তার উপরের কাঁচটা কোনো বিশেষ রং-এর হয় তবে আলোটা লালচে হয়ে বের হয়। ঠিক তেমনি যদিও শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন হয়, তবু বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের জ্ঞানচক্ষুর উপর বিভিন্ন প্রকার রং ছড়িয়ে দেয়। এমনকি একই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষুর উপর বিভিন্ন প্রকার রং লেগে যেতে পারে যদি শিক্ষার ধরন বিভিন্ন প্রকার হয়।

যেমন ধরুন একই সমাজের একশ্রেণীর লোকের জ্ঞানচক্ষুর উপর কোনো রং পড়েনি। জ্ঞান তাদের স্বচ্ছই রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের জ্ঞানচক্ষুর উপর ধরে নিন লাল রং-এর চশমা এবং তৃতীয় শ্রেণীর লোকের জ্ঞানচক্ষুর উপর মনে করুন কালো রং-এর চশমা পরানো রয়েছে। এই তিন শ্রেণীর লোক যখন একই সঙ্গে পৃথিবীর দিকে তাকায় তখন কেউ দেখে পৃথিবী তার নিজস্ব রংয়েই রয়েছে, কেউ দেখে পৃথিবী লাল হয়ে গেছে, আর কেউ দেখে সারা পৃথিবীই যেন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে।

এবার চিন্তা করুন, যারা পৃথিবীকে লাল বা কালো রংয়ে দেখে তারা কি পৃথিবীর প্রকৃত রং কী তা বুঝতে পারে? তা কোনোভাবেই পারে না। ফলে তারা যখন এ পৃথিবীর রংয়ের বর্ণনা দেন তখন যিনি যে রংয়ে দেখেন তিনি সেই রংয়ের কথাই বলেন। ফলে ঐ তিন গ্রুপের কেউই কারো বর্ণনা মানতে পারে না। এ কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব। এমনকি তারা যদি একই মায়ের তিন সন্তানও হয় তবু তারা একে অন্যকে মনে করে ভ্রান্ত। শুধু ভ্রান্ত মনে করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তারা দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য একে অন্যকে চরম বাধা স্বরূপও মনে করে।

যেদেশের জনগণ এই রকম বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত বা বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী, সেদেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ দেশের সরকার তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হয়তো কোনো উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেয়, কিন্তু সে কাজ যদি সাধারণ নাগরিকদের আকীদাবিরোধী হয় তবে জনসাধারণ তা মানতে চায় না। বরং সে কাজে তারা সরকারকে বাধা দেয়। ফলে উন্নয়নমূলক কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই দেখা যায় জনগণ ও সরকার একই মতাদর্শে বিশ্বাসী না হলে সেদেশের কোনো সরকারই বিরোধিতামুক্ত অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। ফলে দেশবাসীর ভাগ্যে নেমে আসে বিভিন্ন ধরনের অভিশাপ। এটা পরীক্ষিত যে, যেসব দেশের জনগণ ও সরকার এক ও অভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী তাদের দেশের উন্নতি

www.pathagar.com

যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুত সম্ভব নয় সেইসব দেশের উন্নতি যেসব দেশের জনগণ ও সরকার পরস্পর বিরোধী মতবাদের বিশ্বাসী।

দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই/একটি বাদে প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের এই একই অবস্থা যে, তাদের সরকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চোখে রঙ্গীন চশমা পরে নিয়েছেন, কিন্তু জনসাধারণ ইসলামী আকীদার অনুসারী। জনগণ চায় ইসলামী সমাজব্যবস্থা, কিন্তু সরকার পরিচালকগণ চোখে যে রংয়ের চশমা পরে নিয়েছেন তারা মনে করেন সেটাই বুঝি দুনিয়ার আসল রং। তাই তারা জনগণের সাথে একমত হতে পারেন না। ফলে রাষ্ট্রে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। এটা আল্লাহর-ই বিশেষ অনুগ্রহ যে দুনিয়ার প্রতিটি দেশেই এমন কিছু শিক্ষিত মুসলমান রয়েছেন যাদের চোখের উপর দিয়ে হাজারো লাল-কালোর ঢেউ বয়ে যাওয়ার পরও তাদের চক্ষুর উপর কোনো লাল-কালোর পর্দা পড়েনি। আজ তাদেরই কারণে সারাবিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। পূর্বলক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন সারাবিশ্ব ইসলামের নূরে আলোকিত হয়ে উঠবে।

ইসলামী শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য এক নয়। সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য উন্নত জীবনযাপনের প্রস্তুতি নেয়া এবং ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতবিশ্বাসের ভিত্তিতে উন্নতমানের সঠিক ও নির্ভুল জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে অজানাকে জানা। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো যে, মাদরাসা শিক্ষার নাম-ই 'ইসলামী শিক্ষা' নয়। ইসলামী শিক্ষা বলতে বুঝতে হবে, সে শিক্ষার প্রতিটি বিভাগই কুরআন ও হাদীসভিত্তিক। অর্থাৎ যার কোনো একটা দিকও ইসলামী আকীদাবিরোধী নয় এমন শিক্ষার নামই হলো 'ইসলামী শিক্ষা'।

ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি

ইংরেজ জাতি যখন মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করার সুযোগ পেলো তখন তা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করলো তা ছিল মুসলমানদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের মানসপুত্রে পরিণত করা।

www.pathagar.com

তাদের সে চেষ্টা সফল হয়েছে। তারা জানতো যে, মুসলমানদেরকে যদি কুরআন-হাদীসের শিক্ষা থেকে ফিরানো না যায়, তাহলে তাদের উপর প্রভুত্ব করা যাবে না। তাই ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাডস্টোন হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন মজিদ হাতে নিয়ে বলেছিল– 'যতদিন না মুসলমানদের এই কুরআন থেকে বিমুখ করা যাবে ততদিন তাদের উপর শান্তির সঙ্গে প্রভুত্ব করা যাবে না।' তাই তারা মুসলমানদেরকে কুরআনবিমুখ করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তাতে তার সফলকাম হয়েছে। অতঃপর তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা নিম্নের কাজগুলো শুরু করলো ঃ

১. ইসলামী আইন-কানুন ও ইসলামী আদর্শকে কুৎসিৎ থেকে কুৎসিতরূপে সমাজের সম্মুখে তুলে ধরা, যেন মুসলমানদের মনে ইসলাম সম্পর্কে যে পবিত্র ধারণা ছিল তা নষ্ট হয় এবং ইসলামের প্রতি যেন প্রত্যেকেরই একটা ঘৃণাভাব সৃষ্টি হয়।

২. ইসলামকে একটা আনুষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে প্রচার করা।

৩. আল-কুরআন শুধু বানান করে পড়লেই অনেক সওয়াব হবে, তা অর্থ বুঝে পড়ার দরকার নেই–এ কথা বুঝানো।

আমরা প্রত্যেকেই বুঝি যে, পড়ার অর্থই হলো বুঝে পড়া। কিন্তু একমাত্র আল-কুরআন যা বুঝে পড়ার বেলাতেই আমাদের ভুল ধারণা যে, তা বুঝে পড়ার পরিবর্তে শুধু বানান করে পড়লেই কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় হয়ে যায়। তারা মুসলমান ছাত্রদের আরো শিখালো ঃ

১. ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থাই উত্তম।

২. তাদের অর্থব্যবস্থাই উন্নততর।

৩. তাদের সমাজব্যবস্থাই আদর্শস্থানীয়।

৪. তাদের গণতন্ত্রই যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য।

৫. ফরাসী বিপ্লবই মানবাধিকারের প্রতি প্রথম স্বীকৃতি দেয়।

এই ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে কৌশলে ও চুপিসারে মুসলমান ছাত্রদের ব্রেন ওয়াশ করে দেয়। ফলে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার ব্যাপারে অমুসলিমদের চাইতে মুসলিম শিক্ষিত সমাজই হলো বেশি তৎপর। তারা শিক্ষাগার থেকে বের হয়েই ইসলামের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

বর্তমান শিক্ষার ধরন ও ফলাফল

বর্তমান সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা দুই বিপরীতমুখী আকীদাভিত্তিক, যথা ঃ

১. আল্লাহবিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণ এবং ২. আল্লাহতে অবিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণ।

প্রথম ধরনের শিক্ষা মানুষকে আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলে, আর দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা মানুষকে নাস্তিক ও বস্তুবাদী করে গড়ে তোলে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিজ্ঞান পড়ায় সময় শেখানো হয় 'পৃথিবীর সৃষ্টি সূর্য থেকে।'

আর ধর্মের পিরিয়ড়ে শেখানো হয় 'পৃথিবী সৃষ্টি আল্লাহর হুকুমে।' এভাবে একই মগজে যখন একই সঙ্গে দুই বিপরীতমুখী ধারণা দেয়া হয় তখন ছাত্রদের মগজ হয়ে যায় ঘোলাটে। ফলে দ্বিমুখী শিক্ষা যে যত বেশি লাভ করে তার মগজ তত বেশি আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে ওঠে। এ কারণেই দেখা যায় উচ্চশিক্ষিত লোকগুলোই বেশির ভাগ আল্লাহবিমুখ, আর কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকগুলোই বেশির ভাগ আল্লাহভীরু। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল তার উল্টো।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের যা শেখায় তার ধরন

সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের ছেলেদেরকে শেখানো হয়, শিয়াল পণ্ডিত কি করে কুমীরের সাতটি বাচ্চাকে লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের কাছে রেখে প্রতিদিন একটা করে খেতো আর কুমীর তার বাচ্চাদেরকে দেখতে গেলে একটাকেই সাতবার দেখিয়ে তাকে ফাঁকি দিতো এই বলে যে, 'এই দেখো তোমার সাত বাচ্চাই বহাল তবিয়তে রয়েছে।'

অংকের মাধ্যমে শেখানো হয়, দুধে পানি মিশিয়ে কি করে ব্যবসায়ে বেশি করে লাভ করা যায়।

আর সুদ কষার মাধ্যমে শেখানো হয় কিভাবে বসে বসে টাকা খাটিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়ে আকাশছোঁয়া ধনী হওয়া যায়।

www.pathagar.com

ভূগোলের মাধ্যমে শেখানো হলো পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সূর্য থেকে– আল্লাহর হুকুমে নয়।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে শেখানো হলো, মানুষের পূর্বপুরুষ 'এককোষী প্রাণী', তারপর কখনো ব্যাঙ, কখনো বানর ও বনমানুষ, এরপর আমরা হঠাৎ করে একদিন মানুষ হয়ে পড়েছি। এতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

অর্থনীতিতে শিক্ষা দেয়া হয় সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফযীলত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শিক্ষা দেয়া হয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহর নয়, মানুষের।

সমাজবিজ্ঞান শেখায় নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন।

বাঙ্গালী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নামে শেখানো হচ্ছে উলঙ্গপনা ও বিজাতীয় সভ্যতা। এটাই হচ্ছে বর্তমান শিক্ষার ধরন।

মনের উপর শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব

মানুষ শুধু বই থেকেই শিক্ষা লাভ করে না, পরিবেশ থেকেও মানুষ কিছু শেখে। বিশেষকরে বাড়ির পরিবেশ থেকে মানুষ কিছু না কিছু শেখেই। আর সেই শিক্ষাই হয় তার বাস্তব গ্রহণযোগ্য শিক্ষা। যাদের বাড়ির পরিবেশ অনেকাংশে ইসলামী তাদের ছেলে-মেয়েরা বাড়ি থেকেই ইসলামের অনেক কিছু শেখে। অনেকে নিয়মিত নামাযীও হয়। পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে যখন নামাযের পরিবেশ পায় না তখন একা একা নামায পড়তে লজ্জা বোধ করে। মন চাওয়া সত্ত্বেও একা একা নামায পড়তে পারে না। পরে শিক্ষার মাধ্যমে যতই ব্রেন ওয়াশ হতে থাকে ততই ইসলামের প্রতি মনে মনে বীতশ্রদ্ধ হতে থাকে।

পরে কারো কারো মনে এমন ধারণা জন্মে যে, এতদিন অজ্ঞতার বশঃবর্তী হয়েই নামায-রোযার খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলাম। পরে তারা যদি সত্যিকারের ইসলামী বুঝ পায় তবে তারাই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট মাথা নত করে কত শুকরিয়া আদায় করে এই কথা বলে, 'আল্লাহ! তোমার হাজারো মেহেরবানী যে, তুমি আমায় নাস্তিকতার খপ্পর থেকে উদ্ধার করেছো। এভাবে শিক্ষার পরিবেশ মানুষকে জান্নাতীও করে আবার জাহান্নামীও করে। এই কারণেই ইসলামী জীবনযাপন করতে হলে মুসলমানদেরকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান কি ইসলামবিরোধী

কিছু গোঁড়া মুসলমান রয়েছেন যারা মনে করেন ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানই ইসলাম। বিজ্ঞানের এমন কিছু শাখা রয়েছে যার সঙ্গে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের আদৌ কোনো সংঘর্ষ নেই। সেগুলো সর্বক্ষণই ইসলামী। তা কোনোক্রমেই গায়ের ইসলামী করা যায় না অর্থাৎ গায়ের ইসলামী করে খাপ খাওয়ানো যায় না। আর বিজ্ঞানের এমন কিছু শাখা রয়েছে যা গায়ের ইসলামী করে খাপ খাওয়ানো যায়, তাই কুচক্রিরা সেগুলোকে গায়ের ইসলামী করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইসলাম কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের উল্লেখিত বিষয়দু'টিকে নিম্নে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হলো ঃ

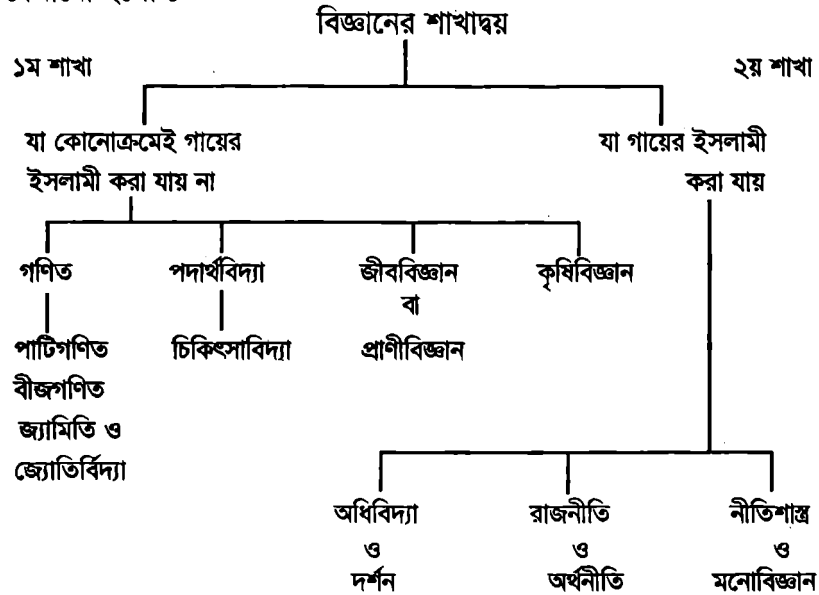

ইসলামী ও গায়ের ইসলামীর পার্থক্য

যা খাঁটি বা নির্ভুল তাই ইসলামী, আর যা অখাঁটি ও ভুল তাই গায়ের ইসলামী। যেমন–আল্লাহ আছেন, তিনি একা, তাঁর কোনো শরীক নেই–এ কথাগুলো যেহেতু খাঁটি কথা, তাই এ কথাগুলোকে 'ইসলামী কথা' বলা হয়। আর যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর ছেলে আছে, স্ত্রী আছে, তাহলে এ

www.pathagar.com

কথাগুলো যেহেতু ভুল কথা, তাই এ কথাকে বলা হয় 'গায়ের ইসলামী কথা'। তাহলে প্রমাণ হলো, যা ঠিক তাই ইসলামী, আর যা বেঠিক তাই গায়ের ইসলামী।

উপরের ছকের বাম পাশে যে বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে সেগুলোকে গায়ের ইসলামী করা যায় না। তার অর্থ হলো ঃ ২+২ =৪-এর স্থলে ৩ বা ৫ বললে তা মানুষের সহজ জ্ঞানেই ধরা পড়ে যে, উত্তর ভুল হচ্ছে। তাই যে বিদ্যায় ভুল শেখানো যায় না সেই বিদ্যার কথাই বলছি যে, তা গায়ের ইসলামী করা যায় না। কিন্তু ডান পাশে দেখানো বিষয়গুলো ভুল শিক্ষা দিয়ে খাপ খাওয়ানো যায়, তাই বলেছি ওগুলোকে গায়ের ইসলামী করা যায়। যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার বেলায় প্রশ্ন ওঠে 'সার্বভৌমত্ব কার'। এর জবাবে বলা হয় তা 'জনসাধারণের'। কিন্তু এ জবাব ভুল। সঠিক জবাব হচ্ছে সার্বভৌমত্ব 'আল্লাহর'। এখানের কোন জবাব ভুল আর কোন জবাব ঠিক তা সহজ জ্ঞানে ধরা পড়ে না যেমন অংকের বেলায় সহজ জ্ঞানেই ধরা পড়ে যে, তা ঠিক, না বেঠিক। তাই বলেছি ওগুলোকে গায়ের ইসলামী করা যায় না। তবে হ্যাঁ, ওগুলোকে গায়ের ইসলামী করা না গেলেও শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে এর দ্বারা ছাত্রদেরকে 'চরিত্রবান' বা 'চরিত্রহীন' কিংবা 'আস্তিক' অথবা 'নাস্তিক' করে গড়ে তোলা যায়।

২+২=৫ বলে খাপ খাওয়ানো যায় না ঠিকই, কিন্তু দুধে পানি মিশানোর ফরমুলা শিক্ষা দেয়া যায়। যেমন ছেলেদেরকে অংক দেয়া হয়, ২০ লিটার দুধ ১ টাকা লিটার দরে ক্রয় করে ১০ লিটার পানি মিশ্রিত করে ১ টাকা লিটার দরেই বিক্রি করলে কত লাভ হবে। এতে ছাত্ররা দুধে পানি মিশানোর অনুপ্রেরণা লাভ করে।

কিন্তু ঐ একই নিয়মের অংক এভাবেও কষতে দেয়া যেতো যে, কোনো ব্যক্তি যদি দুইটি লিপ ইয়ারসহ পুরো ১০ বছর দুধের সঙ্গে প্রতিদিন ১০ লিটার পানি মিশ্রিত করে প্রতিদিন ১০ টাকা হারাম উপার্জন করে এবং এক পয়সা হারাম উপার্জনের জন্য যদি তাকে ১০ বছর জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হয় তবে সে ব্যক্তি ১০ বছর ধরে কত টাকা হারাম উপার্জন করবে এবং তার জন্য তাকে কত বছর জাহান্নামের আগুনে পড়তে হবে, তাহলে ছেলেরা অংকের একই নিয়ম শিখতো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে জাহান্নামের ভয়ও পয়দা হতো এবং ইসলামী মন-মগজ তৈরি হতো।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যদিও জীবদেহের সৃষ্টিকৌশল ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর কোনো ভুল ব্যাখ্যা দেয়া যায় না তথাপি তার আদি সৃষ্টি বা আদি পূর্বপুরুষ সম্পর্কে মানুষকে ভুল ধারণা দেয়া যায়। যার দ্বারা মানুষকে নাস্তিকও করে দেয়া যায়। যেমন জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছেলেদেরকে শিখানো হয়–'মানুষের পূর্বপুরুষ বানর, ব্যাঙ ও আদি পূর্বপুরুষ একাকোষা প্রাণী।' তাহলে প্রমাণ হলো জীবদেহের কোনো একটি অণু-পরমাণুরও ভুল ব্যাখ্যা দেয়া যায় না, তাই সেগুলো ইসলামীই থেকে যায়। কিন্তু তার আদি পূর্বপুরুষ সম্পর্কে মানুষকে ভুল শিক্ষা দিয়ে নাস্তিক করে দেয়া যায়। যা নির্ভর করে শিক্ষাদান পদ্ধতির রচয়িতাগণের ঈমান-আকীদার ওপর।

মানব মনের হিসাব

আল্লাহকে যারা মানে তাদের হিসাব এবং যারা মানে না তাদের হিসাব এক ধরনের হয় না, হয় দুই ধরনের। এটা বুঝার জন্য আমি দুই ধরনের হিসাব পাশাপাশি সাজিয়ে দেখাচ্ছি। লক্ষ্য করুন নিম্নের হিসাবের দিকে ঃ

পরকাল অবিশ্বাসীদের হিসাব	পরকাল বিশ্বাসীদের হিসাব
❐ দুনিয়ার লাভ–লোকসানই প্রকৃত লাভ-লোকসান।	❐ আখিরাতের লাভ-লোকসানই প্রকৃত লাভ-লোকসান।
❐ বহু অর্থবিত্ত ও মান-সম্মানের মালিক হতে পারলে জীবন সার্থক হলো।	❐ খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে জীবনটাকে দান করতে পারলেই জীবনটা সার্থক হলো।
❐ লেখাপড়া শিখতে হবে দুনিয়ায় উন্নত জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে।	❐ লেখাপড়া শিখতে হবে আল্লাহকে চেনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে কোনো পথে সে পথ জানার উদ্দেশ্যে।
❐ সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হবে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে।	❐ সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।
❐ আমার ধন-সম্পদের মালিক আমি নিজেই। সুতরাং আমার ইচ্ছেমতো আমি তা ব্যয় করবো।	❐ আমার ধন-সম্পদের মালিক আল্লাহ, আমি তার হেফাজতকারী মাত্র। আল্লাহ যেভাবে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে খুশি হন, আমার হেফাজতে রক্ষিত অর্থ-সম্পদ সেভাবেই ব্যয়িত হবে।
❐ কোনো সংগ্রাম বা যুদ্ধ করতে গিয়ে বাঁচলে লাভ, মরলে ক্ষতি।	❐ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে বাঁচলেও লাভ, মরলেও লাভ।

www.pathagar.com

এই ধরনের হিসাবের পার্থক্যের কারণে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে চিনতে ভুল করে।

অবিশ্বাসীরা মনে করে–'আমরা যেমন যুদ্ধ করি দেশ জয় করে তার দণ্ডমুণ্ডের মালিক হওয়ার জন্য, বিশ্বাসীরাও সম্ভবতঃ ঐ কারণেই যুদ্ধ করে।'

তারা মনে করে আমরা–'যেমন রাজনীতি করি মানুষের উপর প্রভুত্ব করার উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরাও সম্ভবতঃ ঐ একই উদ্দেশ্যে রাজনীতি করে।'

তারা আসলে বুঝতেই পারে না যে বিশ্বাসীদের জীবনের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য, তাহলো আল্লাহকে রাজি-খুশি করা। এজন্য একজন সাহাবী যখন যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হচ্ছেন তখন তার মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে ঃ

فُزْتُ وَاللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর কসম! আমার জীবন সার্থক হয়েছে।'

বিশ্বাসীরা যখন রাজনীতি করে তখনও উদ্দেশ্য ঐ একটাই যে, মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহরই প্রভুত্ব কায়েম করতে হবে। আর তা যদি না করি তবে আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত দিতে পারা যাবে না। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ঈমানদারদের রাজনীতি করা। কিন্তু এসব কথা অবিশ্বাসীদের মগজে ঢুকবে না। যেমন কালো চশমা চোখে দিলে সে দুনিয়ার সবকিছুকেই কালো দেখে। তেমনি অবিশ্বাসীরা নিজেদের মন দিয়েই অন্যকে বিচার করে।

পরকালে বিশ্বাসীরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যে কাজে নারাজ, সে ধরনের কোনো কাজে দুনিয়ার মানুষ যদি খুশি হয় এবং এমন খুশি হয় যে, সারা পৃথিবীর রাজত্বই তাকে দান করে দেয়, তবু ঈমানদার লোক সে কাজ করবে না।

আর যদি একান্তই কোনো ঈমানদার লোক মানুষকে খুশি করার উদ্দেশ্যে আল্লাহকে নারাজ করে সারা দুনিয়ারও বাদশাহ হয়ে পড়ে তবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল, জীবন বরবাদ হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে ঈমানদার লোক যখন দেখবে যে, আমি অমুক কাজ করলে আল্লাহ খুশি হবেন ঠিকই কিন্তু সে কাজে দুনিয়ার মানুষ এত নাখোশ হবে যে, তারা আমার কলিজা চিবিয়ে খেতে উদ্যত হয়ে যাবে, তখনো একজন

www.pathagar.com

বিশ্বাসী জেনে-বুঝে মৃত্যুর হাতে নিজেকে ঠেলে দিতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। এটাই ঈমানদার ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে ধারণা ও হিসাব। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদারীর লক্ষণ।

এখানে এ ধরনের কয়েকজন ঈমানদারের জীবনী থেকে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করবো যার থেকে বুঝতে সহজ হবে যে, জীবন সম্পর্কে প্রকৃত আল্লাহবিশ্বাসীদের ধারণা কী?

এ ঘটনাগুলো থেকে জ্ঞানীগণ অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃত মুসলমানদের ধ্যান–ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস এবং আমাদের এ যুগের মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে কত পার্থক্য। পড়ুন অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে কয়েকটি ঘটনা ঃ

হযরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খতিবকে হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুনে কুফার হুজর ইবনে আদি তার প্রতিবাদ করেন এবং হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসা করতে শুরু করেন। এর ফলে রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে তাঁকে তাঁর ১২ জন সাথীসহ আমীর মুয়াবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হলো।

তখন আমীর মুয়াবিয় বললো– 'তোমরা যদি অপরাধ স্বীকার করো অর্থাৎ আলীর বৈরীতা প্রকাশ করো তবে তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে, না হলে হত্যা করা হবে।'

হুজর তার জবাবে বললেন–'আমি আমার জীবন রক্ষার জন্য এমন কথা বলতে পারবো না, যে কথায় আমার মা'বুদ আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।'

অতঃপর তাঁদেরকে হত্যা করা হলো।

কারবালার মাঠে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে হত্যা করতে আসলে তিনি শত্রুদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন–'তোমরা কোন অপরাধে আমাকে হত্যা করবে?'

জবাবে একজন বলে ওঠে–'আপনি কেন ইয়াজিদকে খলিফা বলে স্বীকার করেন না?'

তিনি জবাবে বললেন–'আমি নিজেকে অবমাননার সঙ্গে তার হাতে সোপর্দ করে বান্দাহর বন্দেগী মেনে নিতে পারি না। আমি নিজেকে

www.pathagar.com

কলঙ্কিত হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সেই অহংকারীর অহংকার থেকে যে পরকালকে বিশ্বাস করে না।'

অতঃপর তিনি তাদের হাতে নিহত হলেন।

সত্য প্রচার ও স্পষ্টবাদিতার অপরাধে ধৃত হয়ে সাঈদ ইবনে জুবাইর কুফায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দরবারে আনীত হলে বহু কথা কাটাকাটির পর যখন হাজ্জাজ তাঁকে বললো–'তোমাকে এমনভাবে হত্যা করবো যেভাবে অতীতেও কাউকে হত্যা করিনি ও ভবিষ্যতেও কাউকে সেভাবে হত্যা করবো না।'

জবাবে সাঈদ বললেন–'তুমি আমার দুনিয়ার জীবন নষ্ট করবে, কিন্তু আমি তোমার পরকালের জীবন নষ্ট করবো।'

অতঃপর যখন তাঁকে হত্যার হুকুম শুনিয়ে দিলেন তখন তিনি (সাঈদ) হেসে উঠলেন।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো–'তুমি হাসলে কেন?'

তিনি বললেন–'আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার ধৃষ্টতা দেখে এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর ধৈর্য দেখে।'

তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে দু'খানা হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন–'আমার পরে হাজ্জাজ আর যেন কাউকে হত্যার সুযোগ না পায়।'

আল্লাহ পাক এ দোয়া কবুল করেছিলেন। এরপর অন্য কাউকে হত্যা করার পূর্বেই হাজ্জাজের শোচনীয় মৃত্যু হয়।

ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার দাবিতে তুরস্কের 'ইত্তেহাদে মুহাম্মদী' নামে যে সংগঠন ছিল তার নেতা জনাব বদিউজ্জামান নুরসী তাঁর বহু সঙ্গী-সাথীসহ বন্দী হন।

অপরাধ তাঁদের এই যে, তাঁরা ইসলামী হুকুমাত দাবি করেন। এই অপরাধে বিচারপতি পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনিয়ে দেয়ার পর তুরস্কের সিংহপুরুষ বদিউজ্জামানের দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো–'তুমিও কি ইসলামী আইনের প্রবর্তন চাও?'

জবাবে তিনি বললেন–'কোনো ছোট্ট ব্যাপারেও ইসলামের বিপরীত কোনো একটি আইনও আমি মেনে নিতে পারি না। এতে যদি আমার প্রাণ

www.pathagar.com

উৎসর্গ করতে হয় তবে তা আমি করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, আপনি শুনে রাখুন, আমার যদি এক হাজারটা প্রাণ থাকতো তবে তার প্রত্যেকটি প্রাণকেই আমি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলাম।'

তিনি আরো বললেন–'আমি আলমে বরযাখের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রয়েছি। যেকোনো মুহূর্তে আমার সহকর্মী প্রাণ উৎসর্গকারী ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবো এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবনকে উৎসর্গ করে আমার মা'বুদের সন্তুষ্টি অর্জন করবো।'

তাঁর এ কথাগুলো পরদিন প্রচার হয়ে যায় এবং জনসাধারণের তুমুল চাপ সহ্য করতে না পেরে সরকার শেষ পর্যন্ত সিংহপুরুষ বদিউজ্জামানকে সে যাত্রায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

অর্থের ব্যাপারে ঈমানদারী

হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সত্যবাদিতা ও স্পষ্টভাষিতার জন্য মুগ্ধ হয়ে খলিফা মনসুরের স্ত্রী ইমাম সাহেবের নিকট পঞ্চাশ হাজার দিনারের একটা তোড়া উপঢৌকন হিসেবে পাঠান।

আবু হানিফা (র) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলে পাঠান–'আমি আমার নিজের দায়িত্ব পালন করি, এর পিছনে আমার নিজের কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

ইসলামী জীবন সম্পর্কে এইগুলো হচ্ছে সঠিক ধারণা।

যাদের জীবনে এ ধরনের বিশ্বাস রয়েছে অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, আমাকে এমনভাবে জীবন উৎসর্গ করতে হবে যেভাবে জীবন উৎসর্গ করলে আল্লাহ্ খুশি হন। সে জীবন অবশ্যই লাগামহীন অবস্থায় চলতে পারে না। সে জীবনের সম্মুখে এমন একটা নীতিমালা থাকতে হবে যা দেখে সে পথ চলতে পারে। সে নীতিমালার মধ্যে থাকতে হবে এমনসব ব্যবস্থাপনা যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের।

এ ব্যবস্থাপনার এক কথায় নাম দেয়া যায় 'খোদায়ী জীবন বিধান'।

www.pathagar.com

জীবন বিধান

'জীবন বিধান' বলতে বুঝতে হবে মানুষের জন্মের পর থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যত যা কিছু কাজ তাকে করতে হয় সে সবকিছু মানুষ যে নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবিক করে সে-ই গোটা নিয়ম-পদ্ধতিকে এক কথায় বলা হয় 'জীবন বিধান'।

জীব মাত্রই জীবন বিধানের অধীন। মৌমাছি, উইপোকা, বাবুই পাখি ইত্যাদি প্রাণীর দিকে তাকালে সহজেই জ্ঞানে ধরা পড়বে যে, ওরাও একটা জীবন বিধান মেনে চলে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, জীবের জীবন বিধান নিয়ন্ত্রণ করে তার সহজাত স্বভাব, আর মানুষের জীবন বিধান নিয়ন্ত্রণ করে তার বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্মীয় জ্ঞান। সুতরাং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে যত ধরনের মতপার্থক্য আছে, মানুষের জীবন বিধানের মধ্যেও তত ধরনের বিভিন্নতা আছে। মানুষ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি মোতাবেক জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নেয়, কিন্তু তা কোনোকালেও সামগ্রিকভাবে মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর হয় না। এজন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ যে যত ধরনের জীবন বিধানই তৈরি করুক না কেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ– –'শুধুমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা।'

এই ইসলামের মাধ্যমেই আছে মানব জীবনে নির্ভেজাল শান্তি। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً–

অর্থ ঃ তোমরা যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছো তারা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো।

এর ভাবার্থ হলো এই যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহর দেয়া যাবতীয় আইন-কানুন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলো।

'ইসলাম' অর্থ 'শান্তি'। সুতরাং ইসলামী জীবন বিধান বলতে বুঝতে হবে তা এমন এক জীবন বিধান যা জীবনে গ্রহণ করলে তার জীবনে আর

www.pathagar.com

কোনো চোরাপথ দিয়েই কোনো 'অশান্তি' ঢুকতে পারে না। এ বিধানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কায়েম হয় নির্ভেজাল শান্তি।

এ জীবন ব্যবস্থা তিনিই তৈরি করতে পারেন যিনি তৈরি করতে পারেন জীবন। আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি যিনি সৃষ্টি করে তা সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন, জীবন বিধান তৈরি করা তাঁরই কাজ। চাঁদ ও সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণে যেমন মানুষের কোনো দখল নেই তেমনি নির্ভুল জীবন বিধান তৈরি করার ব্যাপারেও মানুষের কোনো দখল নেই। এ কাজে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে তবে বলতে হবে, হয়তো আল্লাহর উপর তার বিশ্বাস নেই নতুবা সে নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বেশি জ্ঞানী মনে করে। এরাই হচ্ছে সেই অধম বোকা–যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–'তারা যে বোঝে না সে বিষয়েও তারা অজ্ঞ।'

আল্লাহ মানুষকে একটা অতিরিক্ত চোখ দিয়েছেন, যে চোখটাকে বলা হয় 'জ্ঞানচক্ষু'। এ চোখ যাদের কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা নেই তাদের সে চোখে পরপারের জীবন দেখা যায়। এ চোখকে যারা অন্ধ করে ফেলেছে তারা যত বড় শিক্ষিতই হোক না কেন, তারা وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (ওয়া হুম লা ইয়াশউরূন)-এর দলভুক্ত। যারা এই ধরনের তথাকথিত শিক্ষিত (pseudonym Intellectuals) তারা জীবন সম্পর্কে কি ধারণা পোষণা করেন তা বুঝানোর জন্য একটা বাস্তব কাহিনী শুনাচ্ছি ঃ

একদিন একজন উচ্চশিক্ষিত লোক তার এক শিক্ষিত বন্ধুকে বলছিলেন–'তোমার ছেলেটাকে মাদরাসায় দিয়ে তার জীবনটাকেই বরবাদ করে দিলে! দেখো আমার ছেলে একটা ইঞ্জিনিয়ার, একটা অ্যাডভোকেট .... ইত্যাদি।'

যিনি 'মাদরাসায় পড়ার' অর্থ 'জীবন বরবাদ' হওয়া মনে করেন, তিনি জীবন সম্পর্কে কি ধারণা পোষণা করেন? তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে জীবন, ঐ জীবনকেই জীবন মনে করেন। জীবনকেই যারা এমন মনে করেন তারাই জীবন বিধান নিজেরা তৈরি করার ঝুঁকি নিয়ে থাকেন।

নিরপেক্ষ জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষিত মুসলমানদেরকে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার জন্য অনুরোধ করবো। চিন্তা করুন, আমরা যারা সমাজ

www.pathagar.com

জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহর ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে নিজেরা আইন তৈরি করি তারা কি সত্যিই আল্লাহর ব্যবস্থার আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি?

চিন্তা করুন, মানুষ–

১. দেখে আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে।

২. শোনে আল্লাহর দেয়া কান দিয়ে।

৩. নিঃশ্বাস নেয় আল্লাহর দেয়া নাক দিয়ে।

৪. দিন হয় আল্লাহর দেয়া সূর্যের মাধ্যমে।

৫. অমাবস্যা-পূর্ণিমা ও জোয়ার-ভাটা হয় আল্লাহর আইনে।

৬. নারী জাতির পেটে সন্তান হয়, মায়ের বুকে দুধ হয় আল্লাহর আইনে। এখন যদি মানুষ চেষ্টা করে যে, আল্লাহর তৈরি অতি পুরাতনকালের এসব আইন মোতাবেক–

১. চোখ দিয়ে দেখবো না, ২. কান দিয়ে শুনবো না .... ইত্যাদি এবং আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে এবার থেকে–

৩. সূর্যকে বাদ দিয়েই দিন সৃষ্টি করবো।

৪. মেয়েদের পরিবর্তে পুরুষের পেটে সন্তান জন্মাবো।

৫. পুরুষের স্তনে দুধ সৃষ্টি করবো।

এটা কি মানুষ পারবে? যদি কোনোদিন তা পারে, তবে সেদিনই এ চিন্তা করা যাবে যে, আল্লাহর আইন বাদ দিয়েই সমাজে শান্তি কায়েম করা যাবে, তার পূর্বে নয়। যে আল্লাহর ব্যবস্থা মানুষ চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে, সূর্য উঠে দিন হবে, মেয়েদের পেটে সন্তান হবে–সেই আল্লাহর-ই ব্যবস্থা ইসলাম দ্বারা সমাজ জীবনে পূর্ণাঙ্গ শান্তি কায়েম হবে।

এটা অত্যন্ত সহজ বুঝ যে, যে আল্লাহর ব্যবস্থায় সূর্যের দ্বারা দিন হয়, সেই আল্লাহর ব্যবস্থায়ই ইসলাম দ্বারা সমাজে শান্তি কায়েম হবে। সূর্যকে বাদ দিলে যেমন দিন হয় না তেমনি ইসলামকে বাদ দিলেও জীবনে শান্তি আসে না। এটা বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। পরীক্ষিত হয়েছে আফ্রিকায়, আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে, চীনে, রাশিয়ায়, বাংলাদেশে ও পৃথিবীর বহু ভূ-খণ্ডে।

www.pathagar.com

শান্তি কায়েম করার জন্য বহু লোকও হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু শান্তি আসেনি কোনো পথেই। প্রকৃতপক্ষে ওগুলো শান্তি আসার কোনো পথ নয়। শান্তি আসার একই পথ, নাম তার 'শান্তিপথ' বা 'ইসলাম'। এতটুকু সহজ বুঝ যাদের মগজে ঢোকে না তাদের মগজ যতই নামকরা হোক না কেন, তাদেরকে আল্লাহ বলেন ঃ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ –'তারা যে অজ্ঞ তা-ও তারা বোঝে না।' কারণ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ –'তাদের অন্তরে হয়েছে রোগ।' (আল-কুরআন)

অন্তরের এই যে রোগটা তার নাম আপনারা কি দিতে চান? আমি সে রোগের নাম দিতে চাই–'মন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত'। মানুষেত পক্ষাঘাত রোগ হলে যেমন তার দেহের অর্ধাংশ বোধহীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি কিছু লোকের মস্তিষ্কের একটা অংশে পক্ষাঘাত হয়ে বোধহীন হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য একটি অংশ ভালোই রয়েছে। মুসলমানদেরকেই দেখি তারা পার্থিব বুঝটা ভালোই বোঝেন, কিন্তু পরকালীন বুঝটা মোটেই যেন বোঝেন না। এজন্যই বলেছিলাম যে, মগজে তাদের পক্ষাঘাত রোগ হয়েছে।

অবশ্য এ রোগের জন্য শুধুমাত্র রোগীরাই দায়ী নয়, দায়ী মুসলিম দেশের শাসকগোষ্ঠীর নির্লিপ্ততা ও সমাজপতিগণ। যারা সত্যিই পরকালের প্রতি বিশ্বাস করেন, তারা আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর একটা যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর খুঁজে বের করুন। যথা ঃ

১. ইসলামের নিজস্ব আইন-কানুন ও নিজস্ব আদর্শ আছে, কি নেই?

২. যদি থেকে থাকে, তবে সেসব আইন-কানুন ও আদর্শ কি ভিন্ন আদর্শের অধীন হতে পারে?

এর 'জবাবে আপনি অবশ্যই বলবেন–'(১ম প্রশ্নের জবাবে) হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।'

২য় প্রশ্নের জবাবে বলবেন–'না, তা পারে না।'

তাহলে এবার বলুন, কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট যখন অন্য প্রেসিডেন্টের অধীন হয় তখন তার প্রেসিডেন্টশীপও থাকে না, তার রাষ্ট্রও থাকে না। এ কথা যখন আমরা ভালোই বুঝি তখন এ কথা কেন বুঝি না যে, ইসলামকে অন্য আইন-কানুনের অধীন করে দিলে সে ইসলাম অবশ্যই তার স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারে না।

www.pathagar.com

যাদের রোগ হয় তাদের যদি কমপক্ষে এতটুকু অনুভূতি থাকে যে, আমার রোগ হয়েছে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহলে এই অনুভূতির কারণে তার হয়তো চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যার রোগ হয়েছে তার যদি সে অনুভূতিই না থাকে, তবে বাঁচার কোনো উপায় হয় কি?

আমি দেখি আমাদের সমাজের অন্যেরা নয়, যারা অত্যন্ত খোদাভীরু কমপক্ষে তারাও কি একবার চিন্তা করেছেন যে, আমরা আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে স্বাধীন, না পরাধীন। তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, আমাদের সমাজে যেসব আইন চালু রয়েছে–যা মেনে চলতে আমরা বাধ্য সেই আইনগুলো কি আল্লাহর তৈরি, নাকি মানুষের তৈরি?

অতঃপর ব্রিটিশ আমল হতে আমাদের এ সমাজের বিভিন্ন বিভাগে যেসব ইসলামবিরোধী আইন-কানুন কায়েম রয়েছে সেগুলো যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়-ই থাকবে, তা পরিবর্তন করার ব্যাপারে মোটেই কোনো চিন্তা-ভাবনা করবো না এবং কোনো বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করবো না, আর নফল ইবাদত করেই মনে মনে তৃপ্তি লাভ করবো, এটা কেমন ধরনের ঈমানের লক্ষণ তা আমার মাথায় ধরে না।

এক্ষেত্রে একটা হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করেই আমরা মনে মনে তৃপ্তি পাই। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ–رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ দেখবে যে, সামাজে অন্যায়-অপকর্ম হচ্ছে তখন হাতের (বা শক্তির) দ্বারা তা পরিবর্তন করবে। আর যদি শক্তি প্রয়োগে অক্ষম হও তবে জবান দ্বারা তা পরিবর্তন করবে, তাতেও যদি অক্ষম হও তবে মন দ্বারা পরিবর্তন (-এর পরিকল্পনা) করবে। শেষোক্ত কাজটি ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।

www.pathagar.com

এখানে বলা হয়েছে–'ফালইউ গাইয়িহু' তাকে পরবর্তন করতেই হবে। তা কিভাবে করা যাবে বা কিসের দ্বারা করা যাবে তারই জবাবে বলা হয়েছে, 'বি' (অর্থ 'দ্বারা') 'ইয়াদ' (অর্থ 'হাত') অর্থাৎ হাতের দ্বারা (এখানে 'হাত' অর্থ 'শক্তি')। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কথার দ্বারা–এখানে কথার অর্থ 'আন্দোলন' ও 'দাবি উত্থাপন'।

অনেকে বলতে পারেন 'কথা'র অর্থ আবার 'আন্দোলন' হলো কবে থেকে আর কথার অর্থ 'দাবি'-ই হলো কি করে?

এর জবাব, আমরা যখন বলি জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে, তখন মুখের এই শব্দগুলোকে 'কথা'-ই বলা হয়। কিন্তু এই কথায় মাধ্যমে যেহেতু কিছু চাওয়া হয় তাই ঐ কথারই নাম হয় 'দাবি'।

অতঃপর দুই/একজন ব্যক্তি দাবি করলে তাকে দাবিই বলা হয়। কিন্তু একই দাবি যখন সবাই করে তখন ঐ দাবিরই নাম হয় 'আন্দোলন'।

এখানে লক্ষণীয় যে, কথাটা বলেছেন আল্লাহর রাসূল, আর তিনি বলেছেন তার সকল উম্মতকে লক্ষ্য করে। সুতরাং এখানে সবাই যখন দাবি করবে তখন তা আর দাবি থাকবে না, তা পর্যবসিত হবে আন্দোলনে। তাই আমি 'ফা-বিলিসানিহি' থেকে 'আন্দোলন' অর্থ করেছি।

৩য় 'ফা-বিকালবিহি' বা মন দ্বারা। দেখুন 'দ্বারা' শব্দটি তিনটি কথার সঙ্গেই রয়েছে। 'পরিবর্তন করো মন দ্বারা'। একশ্রেণীর মুসলমান বাক্যের এ অংশটুকুর অর্থ করেন 'মনে মনে বেজার হওয়া দ্বারা'।

এর থেকে মনে মনে বেজার হওয়া কি করে আবিষ্কার হলো এটা আমার বুঝে আসে না। মনে মনে বেজার হলেই কি একটা সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়? তা হয় না। কিন্তু এখানে 'পরিবর্তন করতে হবে' কথাটা যদি তিনটি কথার পূর্বেই ব্যবহার করি তাহলে দেখতে হবে 'মন দ্বারা' কি করে পরিবর্তন করা যায়।

মন দ্বারা পরিবর্তনের অর্থই হলো অন্যায়কে পরিবর্তনের জন্য মনে মনে কোনো পরিকল্পনা তৈরি করা–যার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন আসবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্যায় অপসারণ করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শক্তির দ্বারা পরিবর্তন করলে খুব কম সময়েই সমাজ সংশোধন হতে পারে। তাই যে

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময় বেশি ব্যয় হবে সেটাকে আল্লাহর নবী দুর্বল ঈমানের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নবী (সা)-এর এ নির্দেশ শুধু আরবের মুসলমানদের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই। তাঁর নির্দেশ হলো, পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডের মুসলমান যদি তাদের সমাজে কোনো মুনকার বা ঘৃণিত কাজ (যা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত) হতে দেখে তবে তা যেন তারা পরিবর্তন করে।

'পরিবর্তন' করার অর্থ অন্যায় কাজ তুলে দিয়ে সেখানে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই হচ্ছে মুসলমানদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য নবী (সা) হাতের ব্যবহার করতে বলেছেন। 'হাত' শব্দটা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই দুই অর্থে ব্যবহার করা হয় ঃ

১. হাত, এবং ২. শক্তি বা ক্ষমতা। যেমন আমরা যখন বলি–'তোমার ছেলের চাকরি দেয়ার ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই' তখন সে 'হাত' অর্থ 'ক্ষমতা'। আরবী يَدٌ (হাত) বহুস্থানে 'ক্ষমতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ –'ধ্বংস হয়ে গেছে আবু লাহাবের হাত।'

এখানে 'হাত' অর্থ 'শক্তি'। যেখানে বলা হয়েছে اِنَّ يَدَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ –'অবশ্যই আল্লাহর হাত জামায়াতের উপর।' এখানে 'আল্লাহর হাত' বলার অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে, আমাদের হাতের মতো আল্লাহরও দু'খানা হাত রয়েছে। এর অর্থ 'জামায়াতবদ্ধ অবস্থায় যারা অন্যায়কে অপসারিত করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে সেখানে আল্লাহর শক্তি তাদেরই পক্ষে থাকে।'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'বিইয়াদিহি' অর্থ শক্তির দ্বারা'।

কিন্তু আল্লাহ জানেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য সমানভাবে থাকবে না। থাকবে সাধারণতঃ তিন ধরনের ঃ

১. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শাসনতন্ত্রে ইসলামকে মর্যাদা দানের ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

২. মুসলিম সংখ্যালঘু অথবা রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে।

৩. রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ধর্মকে অস্বীকার করার ভিত্তিতে।

এই তিন ধরনের দেশের মুসলমানদের জন্য পর্যায়ক্রমে উক্ত তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এটাই হচ্ছে উক্ত হাদীসের সারমর্ম। এখানে 'মনে মনে বেজার' হওয়ার প্রশ্নই নেই।

আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেই যে, বেজার হলে দুর্বল অবস্থায়ও ঈমান বেঁচে যাবে, তা বাঁচতে পারে চীন ও রাশিয়ার মুসলমানদের। এ কৈফিয়তে বাংলাদেশের মুসলমানদের গা বাঁচবে বলে মনে মনে তৃপ্তি পাওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

আমি বুঝি না যে, আমরা এমন হয়ে গেলাম কি করে? যে সমাজে অন্যায়-অপকর্ম হতে দেখবো অথচ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলবো না, আর নফল ইবাদত করেই মনে মনে তৃপ্তি লাভ করবো! এ ধরনের বুঝ কি করে আমাদের সমাজে স্থান পেলো? এসব চিন্তা করেই আমার মনে হয় যেন আমাদের মগজে পক্ষাঘাত রোগ হয়েছে।

অন্যদের কথা বাদ দিয়ে শুধু ধর্মভীরুদের কথাই বলি, তাদেরও কি মগজে এসব কথা ধরবে না? এসব বিষয়ের উপর চিন্তা করবেন না?

আমরা দেখি কোনো ব্যক্তি জেল-হাজতে বন্দী হয়ে পড়লে সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সে পেরেশান হয়ে যায়। আমরা দেখি, কোনো স্ত্রীকে তার স্বামীর হাত থেকে যদি অন্যকোনো পুরুষ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে সে স্ত্রীলোকটা নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

তেমনি আমরা মুসলমানরাও তো আমাদের ইসলামের নিজস্ব আইন-কানুন, সভ্যতা ও আদর্শ থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন আইন-কানুনের ও ভিন্ন আদর্শের অধীন হয়ে গেছি। এজন্য আমাদের মধ্যে তো কোনোই অস্তিরতা নেই। এর কারণ কি? এর কারণটাও কি চিন্তা করে বের করতে হবে না?

www.pathagar.com

মানব রচিত জীবন বিধান

আল্লাহ দেয়া জীবনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে যারা নিজেরা জীবন বিধান তৈরি করে তারা যেহেতু অভাবমুক্ত নয়, তাই তারা তাদের নিজের তৈরি আইনের মধ্যে তাদের নিজেদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা রাখেই। এ ব্যবস্থায় একশ্রেণীর লোককে বানায় 'প্রভু' এবং আরেক শ্রেণীর লোককে পরিণত করে 'দাসে'। আর এই সমাজব্যবস্থায় জন্ম নেয় নিত্য নতুন 'ইজম' বা 'মতবাদ'।

এসব মতবাদের মধ্যে এমনও কিছু মতবাদ আছে যেগুলো আল্লাহকে আকাশে স্বীকার করে কিন্তু জমিনে স্বীকার করে না। আর কিছু মতবাদ আছে যা আল্লাহকে আদৌ স্বীকার করে না। এসব মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা। সে সমাজে আজ যেটাকে নির্ভুল মনে করা হচ্ছে কাল সেটাকে ভুল মনে করা হবে এবং কাল যেটাকে নির্ভুল মনে করা হবে পরশু সেটাকে ভুল মনে করা হবে। এটাই হচ্ছে মানব রচিত জীবনব্যবস্থার ধারা।

কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভুলের কোনো অবকাশ নেই। আমরা দেখতে পাই আল্লাহর বিধানের অধীনে যেখানে রাত-দিন, ঋতুর পরিবর্তন, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি হচ্ছে সেখানে এমন কখনো দেখা যায়নি যে, তা একবার চালু হয়ে যাওয়ার পর সংশোধনের কোনো প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আল্লাহ তাঁর যে বিধান চালু করে রেখেছেন সেই ব্যবস্থা আজও চালু রয়েছে। মাঝে মাঝে তা সংশোধন করে নেয়ার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু মানুষের তৈরি আইন বারবার সংশোধন করেও দেখা যায় তা ত্রুটিমুক্ত হয় না। সকল শ্রেণীর নাগরিকদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু আল্লাহর বিধানে কোনোই খুঁত কেউ কোনোদিন আবিষ্কার করতে পারেনি।

এসব জানা-বুঝা সত্ত্বেও অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে মানুষ যখন মানব সমাজের জন্য আইন তৈরি করে তখন একশ্রেণীর লোক

www.pathagar.com

যেহেতু প্রভুতে পরিণত হয় এবং অন্য শ্রেণী হয় দাস, তাই তখন আল্লাহপাক নবী প্রেরণ করেন এজন্য যে, তাঁরা যেন জনগণকে মানুষের দাসত্ব করার হাত থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বান্দাহয় পরিণত করে দিতে পারেন।মানুষ যারই দাসত্ব করে তারই দাসে পরিণত হয়। আর মানুষ যখনই মানুষের দাসে পরিণত হয় তখন যেসব বিষয়ে খোদার হুকুম আর মানুষ প্রভুর হুকুমের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন মানুষ প্রভুর হুকুমই মানতে বাধ্য হয়।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আল্লাহ হুকুম করলেন, নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত সর্বক্ষণই ঢেকে রাখবে, কিন্তু মানুষ প্রভু হুকুম করলো মাঠে কাজ করার সময় হাফ প্যান্ট পরতে হবে। এক্ষেত্রে মানুষ যারা পরের কাজ করে তারা যখন দেখে যে, আল্লাহর হুকুম মানতে গেলে হাফ প্যান্ট পরা যাবে না, আবার হাফ প্যান্ট না পরলে কাজ পাওয়া যায় না তখন মানুষ রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়েই ফরয তরক করে।

মানব রচিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় শুধু দুই/এক ক্ষেত্রে নয়, বহুক্ষেত্রে। তাই আল্লাহ বলেন–'লা ইউশরিক বি ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা' অর্থাৎ 'হুকুম মানার ব্যাপারে বা দাসত্ব করার ব্যাপারে যেন তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে।'

অর্থাৎ যেখানে মানুষ ও আল্লাহর হুকুমের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে সেখানে আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে যদি মানুষের হুকুম মানা হয় তবে আল্লাহ বলেন, তাতে শির্ক করা হয়। নমরূদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ যারা খোদায়ী দাবি করেছিল করে আমরা জানি তারা কিন্তু সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার দাবি করেনি, দাবি করেছে শুধু মানুষের উপর হুকুমদাতা ও আইনদাতা হওয়ার। তা সত্ত্বেও তাদেরকে বলা হলো খোদায়ীর দাবিদার। কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই আইনদাতা ও হুকুমকর্তা হওয়ার অধিকারী হতে পারে না

অতঃপর যারা তাদেরকে প্রভু বলে মেনে নিয়ে তাদের হুকুমমতো চলতে থাকলো তাদেরকে আল্লাহর নবীগণ বলে দিলেন যে, তোমরা শির্ক করে মুশরিক হয়ে গেছো, কারণ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের হুকুম মেনে চলছো।

www.pathagar.com

আল্লাহর দৃষ্টিতে মানব জীবন

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ -

অর্থ ঃ অবশ্যই আমি (আল্লাহ) মানব জাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছি।

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থ ঃ পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তা সব-ই তোমাদের (সেবার) উদ্দেশ্যে।

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -

অর্থ ঃ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত।

মানুষের জীবন আল্লাহর নিকট খুবই মূল্যবান। এই যে আসমান-জমিন, চাঁদ-সূর্য, মেঘ-বৃষ্টি, গাছের ফল, গাভীর দুধ ইত্যাদি যাবতীয় পার্থিব সম্পদের প্রত্যেকটি জিনিস-ই মানুষের জন্য। এছাড়া কল্পনার অতীত পরম শান্তির 'বেহেশতখানা' তা-ও তৈরি শুধু মানুষের জন্য। সুতরাং এ মানব জীবনকে ক্ষুদ্র একটা কিছু মনে করার কোনো উপায় নেই, কোনো সঙ্গত কারণও নেই।

এ জীবন অবহেলার ও উপেক্ষারও নয়। এই জীবনের সম্মান ও মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। তাই এই জীবন হেলায় নষ্ট হোক আল্লাহ তা চান না। আল্লাহ চান না যে তার সৃষ্টির সেই মানব জাতি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট মাথা নত করবে। এমনকি মানব ও অন্যান্য প্রাণীর দেহ সৃষ্টির ব্যাপারেও আমরা দেখি সমস্ত প্রাণীর মাথা নিম্নমুখী। কিন্তু একমাত্র মানুষের-ই মাথা উর্ধ্বমুখী।

এই মানুষের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী তাদের প্রাণ উৎসর্গ করে। আমরা খাদ্য হিসেবে যে মাছ-মাংস খেয়ে, ওষুধ হিসেবে প্রাণীদেহের অনেক কিছু ব্যবহার করি, প্রাণীর হাড়, চামড়া ইত্যাদি আমরা মানুষ জাতি

www.pathagar.com

ব্যবহার করি, এর একমাত্র কারণ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষ। আর মানুষের জন্যই অন্যান্য সৃষ্টি। সেরা সৃষ্টি যদি সেরার মর্যাদা রক্ষা না করে তবে আল্লাহর দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত দোষণীয় এবং এটা আল্লাহ কখনো সহ্য করেন না।

সেরার মর্যাদা রক্ষা হয় না দুই কারণে। যথা ঃ ১. অন্যায়ভাবে সমাজের প্রভু হয়ে বসা এবং ২. আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ প্রভুর হুকুমমতো জীবন যাপন করা। এ দুটোই সমান পাপ যেমন সুদ দেয়া ও নেয়া সমান পাপ।

এ মানব জীবনকে ধ্বংস করার জন্য একটা সুপরিকল্পিত পন্থা চালু রয়েছে যার প্রবর্তক ইবলিস। যে পন্থা বাস্তবায়িত হয় এক শ্রেণীর মানুষের দ্বারা যারা জ্ঞানের অগোচরে ইবলিসের এজেন্ট হয়ে কাজ করে।

আর মানব জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহরও একটা ব্যবস্থা রয়েছে। সে ব্যবস্থা হলো নবীগণের মাধ্যমে মানুষের ভুল সংশোধন করা ও সঠিক পথে মানব সমাজকে পরিচালিত করা। আল্লাহ তাঁর বান্দাহর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাই তিনি প্রত্যেক যুগেই মানুষকে পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। এ যুগে নবী না থাকলেও বিশ্বনবী (সা)-এর দেখানো পথ রয়েছে, কুরআন ও হাদীস রয়েছে। তা যদি মানুষ পূর্ণরূপে পালন করে তবে মানুষ অবশ্যই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু সবসময় সাবধানতা অবলম্বন না করলে বা বিচক্ষণতার সাথে সর্বক্ষণই হুঁশিয়ার না থাকলে নামাযের মধ্যেও শয়তানের খপ্পরে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।

সাবধানতার দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. মনে রাখতে হবে, যে পথেই হেদায়েত সেই পথেই বাধা।

২. যা প্রকৃত হেদায়েতের পথ নয় সেই পথে কোনো বাধা নেই।

৩. যাদের ডাকে মানুষ গোমরাহ হবে তাদের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সহায়তা করবে সবাই। বিশেষ করে সমাজপতিদের পক্ষ থেকে সে পথকে উৎসাহিত করা হবে।

৪. যাদের ডাকে মানুষ হেদায়েত পেতে পারবে তাদের পথে চলতে হাজারো বাধার সৃষ্টি হবে। বিশেষকরে সমাজপতিদের পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

জোরালো বাধা সৃষ্টি হবে। এ বাধার ধরনগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি ছাড়া ধরা যাবে না।

আলেমদের একশ্রেণীকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'ওলামায়ে সু' (سُوْء)। এ শ্রেণী সবসময় সমাজপতিদের দলে থাকে। তাদের সম্মান-মর্যাদা সাধারণ মানুষ না দিলেও সমাজপতিরা ঠিক-ই দিয়ে থাকে। এই দলভুক্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন 'আবুল ফজল ফৈজী'।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেমদেরকে বলা হয় 'ওলামায়ে হাক্কানী'। তাঁদের বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেকটি কায়েমী স্বার্থবাদী সোচ্চার থাকবে। বিশেষকরে সমাজপতিরা তাদের বিরুদ্ধে লেগে থাকবেই। ওলামায়ে সুদেরকে সমাজপতিরা ওলামায়ে হাক্কানীদের পিছনে লাগিয়ে দেয়। তাদের কাজ হয় শুধু ভালো লোকদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাণ ছোড়া। এতে লাভ হয় এতটুকু যে, পাগড়িধারী আলেমদের পক্ষ থেকে যখন ফতোয়া আসে যে, অমুক ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে তখন সাধারণের মনে সেসব আলেমদের প্রতি একটা ঘৃণাভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। ব্যস, এতটুকুতেই তাদের সাফল্য। সাধারণ লোক আর তাদের কথা শুনবে না। এতেই ইবলিসের জয়।

চিন্তা করুন এবং ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করুন, দেখুন বিগত প্রায় ১৪০০ বছরের মধ্যে যারা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের বিরুদ্ধেই এসেছে ফতোয়া। এমনকি ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (র)-এর বিরুদ্ধেও ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

আপনি জেনে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, বুখারী শরীফের মূল কিতাব সংকলিত হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। তার বাংলা অনুবাদের মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীর একজন আলেমের বিরুদ্ধেও ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এটা এত সূক্ষ্ম হামলা যে, সে কথা অনেক শিক্ষিত লোকও বুঝতে অক্ষম।

যেমন একদিন একজন উচ্চশিক্ষিত লোক আমাকে বলেছিলেন–'অমুক আলেমের প্রতি আমার বেশ ভক্তি ছিল, কিন্তু বাংলা বুখারী শরীফ পড়ে আমার সে ভক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।'

আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম–'বলুন তো বুখারী শরীফের মূল কথাগুলো কার?'

www.pathagar.com

তিনি বললেন–'নবী করিম (সা)-এর।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম–'সেই নবী (সা)-এর কথার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর একজন আলেমের নাম স্থান পেলো কি করে? তিনি কি অমুক আলেমের নাম ধরে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন?'

তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন–'ঠিকই তো! এটা তো সত্যিই বিভ্রান্তিমূলক বিষয়।'

উক্ত ধরনের বিভিন্ন দিক থেকে মনকে হুঁশিয়ার না রাখতে পারলে মহামূল্যবান ঈমানী জীবন ধ্বংস হতে বাধ্য।

মনের পরিচয়

মানুষকে যারা পথভ্রষ্ট করতে চায় তারা মানুষের মনকেই সর্বপ্রথম আক্রমণ করে। 'মন' এমন জিনিস যে, এর সামনে যে জিনিস ধরা যায় তার একটা ছবি গেঁথে যায় মনের মধ্যে। অতঃপর ঐ ছবিকে সে আপন বলে গ্রহণ করে নেয়। এটাই হচ্ছে মনের ধরন বা মনের ধর্ম। এটা জেনে-বুঝেই চক্রান্তকারীরা আমাদের মনের সামনে এমন কিছু জিনিস ধরে রেখেছে যার একটা ছবি মানসপটে গেঁথে গিয়েছে। ব্যস, সেটাকেই আমরা চিনি ও জানি। তার বাইরে কিছুই আর বুঝতে চাই না।

এটা বুঝার জন্য একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। দেখুন, এ সমাজের প্রত্যেকেই জানে যে, ১. নফল ইবাদত না করলে গুনাহ নেই, করলে অনেক সওয়াব। ২. সুদ অত্যন্ত গুনাহর কাজ।

কিন্তু নফল ইবাদতের পথকে সুগম করা হয়েছে বলে আমরা যেহেতু নফল ইবাদত খুব করতে পারি, তাই নফল ইবাদতের একটা ছবি অন্তরে গেঁথে গেছে। ফলে নফল ইবাদতকে এত বেশি মহব্বত করি যে, যদি কোনো দিন এক ওয়াক্ত আউয়াবীন নামায বাদ পড়ে তবে চোখে পানি এসে যায়। কিন্তু যখন খাজনার সঙ্গে সুদ দিয়ে দাখিলাটা বুক পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরি তখন মন কত উৎফুল্ল যে, জমিটা তো রক্ষা করলাম!

কেন এ অবস্থা? যে নফল নামায আদায় করতে না পেরে চোখে পানি আসে–যে ব্যাপারে আল্লাহ তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না অথচ যার

www.pathagar.com

জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে তার বেলায় তার মনে আনন্দ যে, জমিটা তো রক্ষা হলো!

কেন এ অবস্থা যে, সুদ দিয়ে মনের মধ্যে আনন্দ হয় আর নফল বাদ পড়লে পরকালের ভয়ে চোখে পানি? এটাই হচ্ছে মনের উপর ইবলিসী হামলার জয়লাভ।

জাতীয় আদর্শের অনুপস্থিতিতে মনের অবস্থা

মানুষ যখন তার প্রচলিত সমাজে তাদের কোনো নিজস্ব আদর্শ বা নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি খুঁজে পায় না তখন যা সামনে পায় তা-ই মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয়। যেমন দেখুন, মাত্র ত্রিশ/চল্লিশ বছর পূর্বে বাংলার মানুষ লম্বা চুল (বিশেষ করে কানের ও ঘাড়ের উপর লম্বা চুল) রাখাকে ঘৃণা করতো। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সে ঘৃণা এখন ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে।

আজ থেকে বিশ বছর পূর্বেও দেখেছি শুধু মেথরাণী মেয়েরাই নাভির নিচে শাড়ি পরতো, আর তাদের ব্লাউজে শরীর পুরো ঢাকা পড়তো না।

অন্যদিকে আজ আমাদের মেয়েরা যেভাবে কাপড় পরে এবং যে ধরনের ব্লাউজ ব্যবহার করে তা যদি বিশ বছর পূর্বে কেউ ব্যবহার করতো তাহলে সেদিন তাকে বলা হতো–'তুমি কি মেথরাণী?'

কিন্তু আজ সে চোখ নেই, সে দৃষ্টিভঙ্গিও নেই। জীবন ও মন এভাবেই ক্রমান্বয়ে ভুল পথে পরিচালিত হয়। বিশ বছর পূর্বে আমাদের এই চোখেই যে কাজকে দোষণীয় কাজ হিসেবে দেখেছি, আজ সেই চোখেই উক্ত কাজকে কোনো দোষণীয় কাজ মনে করি না। জীবন এভাবেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

দেখুন, সমাজে যেভাবে নৃশংসতা বেড়েছে তাতে বহু চিন্তাশীল লোককেই মন্তব্য করতে শুনেছি যে, 'আমরা ক্রমে ক্রমে বর্বরতার দিকে এগোচ্ছি।'

গুপ্তহত্যা, নারী ধর্ষণ ও হাইজ্যাক–যা চরম বর্বরতার নিদর্শন তা প্রতিদিন-ই খবরের কাগজে পড়ি। এতে মনের মধ্যে কোনোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

www.pathagar.com

কিন্তু চল্লিশ বছর পূর্বে এ ধরনের কোনো খবর পত্রিকার পাতায় পড়লে সারাদেশের মানুষের মন আতঙ্কিত হয়ে উঠতো। দেশে একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হতো, প্রতিবাদে সবাই সোচ্চার হয়ে উঠতো। দেশের সরকারও অস্থির হয়ে উঠতো তা কঠোর হাতে দমন করার জন্য। আর আজ কি হচ্ছে?

আজ মানুষের জীবনের মূল্য একটা চুনোপুটির জীবনের মূল্যও রাখে না। যত্রতত্র লোক হত্যা। এতে সমাজেরও কোনো মাথাব্যথা নেই, সরকারেরও কোনো মাথাব্যথা নেই।

এভাবে আমরা কোথায় যাচ্ছি তা প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিরই ভেবে দেখা উচিত যে, এর কি কোনো প্রতিষেধক নেই?

রাসূল (সা)-এর সম্পর্কে আমাদের ধারণা

আমরা মনে করি, আল্লাহর নবী সম্ভবতঃ কোনো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি শুধু খানকায়ী তা'লিম দিতেন। আর মাঝে মাঝে সাহাবীদের নিয়ে দল বেঁধে তাবলীগ করতে বের হতেন। সুতরাং আমরাও তাই করে নবীর সুন্নাত আদায় করি।

কিন্তু রাসূল (সা)-এর পেটে পাথর বাঁধার সুন্নাত তো আমরা একটা দিনের জন্যও এমনকি একটা সেকেন্ডের জন্যও কেউ পালন করলাম না। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে যদি কমপক্ষে এক সেকেন্ডের জন্যও পেটে একটা পাথর বাঁধতাম তবু সে সুন্নাতটা পালন করেছি বলে পরকালে দাবি করতে পারতাম।

তা কেন পালন করি না? আসলে আল্লাহর নবী (সা) ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করেছেন ঠিকই, তবে ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধেননি। পেটে পাথর বাঁধার যে কথাটা কিতাবে রয়েছে সেটা একটা শব্দের সামান্যতম পরিবর্তন মাত্র। আরবীতে حَجَر শব্দের অর্থ 'পাথর', কিন্তু ر -এর উপর একটা নোক্তা দিলে ঐ শব্দই হয়ে যায় حَجَز। এর অর্থ 'কোমরবন্দ' অর্থাৎ সে যুগে সৈনিকদের পেটে বেল্টের ন্যায় এক ধরনের রশি বাঁধা থাকতো

www.pathagar.com

সেটার বাঁধনের নাম حِجْز। আল্লাহর নবী (সা) যেহেতু সৈনিক ছিলেন তাই তাঁর পেটে 'কোমরবন্দ' থাকতো, কিন্তু তা সর্বদাই ঢিলা জামার নিচেই বাঁধা থাকতো।

উক্ত রশি একদিন রাসূল (সা)-এর কোমরে বাঁধা দেখে সাহাবীগণ তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই শব্দটার মধ্য থেকে শুধুমাত্র ز-এর নোক্তাটার হেরফের করে শিখানো হলো যে, হে মুসলমান জাতি! তোমরা এমন নবীর উম্মত যে, তোমাদের নবী না খেয়ে পেটে পাথর বাঁধার শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার বুকে পেট পুরে খাওয়ার আশা কোর না, পেট পুরে খাবে বেহেশতে গিয়ে।

উক্ত শিক্ষার সুযোগ ধরে কম্যুনিস্টরা প্রচার করলো–'ইসলামে ভাত-কাপড়ের গ্যারান্টি নেই, আছে পেটে পাথর বাঁধার গ্যারান্টি।'

তারা আরো বলতে সুযোগ পেলো–'ইসলাম গরীবদের পক্ষে নয়, ইসলাম বুর্জুয়া ও শোষকদের স্বার্থ রক্ষাকারী।'

এ ধরনের অনেক কথাই তারা বলার সুযোগ পাচ্ছে, আর সেই সুযোগ ধরে তারা কোটি কোটি মুসলমানের জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

তবে এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বেশ কিছু লোক বিশ্বাস করেন, সেটা 'পাথর'-ই ছিল। কারো বিশ্বাস সেটা 'কোমরবন্দ' ছিল। ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেব হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র) পাথরবিশ্বাসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি 'কোমরন্দ' বা এ সংক্রান্ত শব্দটাকে حِجْز বলে বিশ্বাস করতেন।

অন্যদিকে কলকাতার আযানগাছীর মরহুম পীর সাহেব হুজুর (র) শব্দটাকে حَجَر বা 'পাথর' বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি এর বিপরীত কিছু বিশ্বাস করতেন না। তবে এগুলো কোনো দলিল হিসেবে আমি পেশ করছি না। এটা হচ্ছে আমি যা জানি তাই এখানে তুলে ধরা। যদিও দিল্লীতে ছাপা বুখারী শরীফের মূল হাদীসে দ্বিতীয় জেলদে আহযাব যুদ্ধের বর্ণনায় بِحَجَرٍ শব্দ রয়েছে, তবু ফুরফুরার হুজুর একবার মিশরী ছাপা একখানা হাদীসে শব্দটাকে بِحِجْزٍ বলে আমাকে দেখিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

উক্ত বিষয়ে কারো বর্ণনায় এই মতটা পাওয়া যায় যে, আহযাবের যুদ্ধে খাদ্যের দারুণ অভাব ছিল। মশহুর কারো কারো বর্ণনায় যুদ্ধকালীন সময়ে রসদের অভাব ছিল না। তবে এ কথায় কোনো দ্বিমত নেই যে, হুজুরে পাক (সা) সেসময় খন্দক তৈরির ব্যাপারে এত বেশি নিজে ও সঙ্গীদেরকে ব্যস্ত রেখেছিলেন যে, নামাযের সময় পর্যন্ত দেয়া হয়নি। সুতরাং যেখানে নামাযের জন্য সময় দেয়া হয়নি সেখানে খাওয়ার জন্যও সময় দেয়ার কথা নয়। কারণ শত্রুরা কত দূরে ছিল এবং কতক্ষণে তারা এসে পৌঁছতে পারবে এ হিসাব রাসূল (সা)-এর নিকট ছিল।

আমি কারো বিশ্বাসের উপর জবরদস্তি কোনো মত চাপাতে চাই না। তবে আমার নিকট ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেবের মতটাকে 'সঠিক' বলে মনে হয়। অবশ্য এমন কোনো পাথর থাকা অসম্ভব নয় যে তাতে পেটকে ঠাণ্ডা রাখতে পারে কিংবা সাময়িক ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। তবে এমন কোনো পাথরের কথা আজ পর্যন্ত কারো মুখে শোনা যায়নি।

আল্লাহর নবী (সা) সৈনিক ছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধের অস্ত্র সর্বদাই সঙ্গে রাখতেন। নামাযের সময় তিনি এবং তাঁর সাহাবী সৈনিকগণ যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো দেহ থেকে নামিয়ে রাখতেন।

যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রের আরবী নাম 'মেহরাব'। এজন্য অস্ত্র রাখার স্থানকে ঐ মেহরাবই বলা হতো। আজ সে মেহরাব 'মেহরাব' নামেই বিদ্যমান রয়েছে বটে, কিন্তু তার অর্থ হয়েছে 'ইমাম দাঁড়ানোর জায়গা।'[১] আর সে মেহরাবে পূর্বে যেখানে থাকতো যুদ্ধাস্ত্র আজ সেখানে থাকে ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবদের জুতো।

আজ যদি আল্লাহর নবী (সা) জিন্দা হয়ে নামাযের সময় কোনো মসজিদে ঢুকতেন তাহলে দেখতে পেতেন মেহরাবে অস্ত্র রাখার পরিবর্তে রাখা হয় জুতো-সেন্ডেল। তিনি এ অবস্থা দেখে কি মনে করতেন তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তবে তিনি হয়তো মনে করতেন যে, এ যুগের মুসলমানরা তলোয়ারের পরিবর্তে জুতো দিয়ে জিহাদ করে।

টীকা–১ ঃ অবশ্য প্রকোষ্ঠকেও 'মেহরাব' বলা হয়। কিন্তু মসজিদে ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর জায়গার নাম 'মেহরাব' নয়–যা সাধারণতঃ আমরা মনে করে থাকি।

www.pathagar.com

সে যুগে মুসলমানগণ শত্রুর ভয়ে নামাযের সময় যুদ্ধাস্ত্র সিজদার সামনে রাখতেন, আর এ যুগের মুসলমানগণ চোরের ভয়ে জুতোজোড়া নিয়ে সিজদার সামনে রাখেন। এই ছোট্ট বিষয়টি থেকেই বুঝতে পারি যে, সে যুগের মুসলমান ও এ যুগের মুসলমানদের মধ্যে কত বিরাট পার্থক্য। অথচ আমরা মনে করি যে, তাঁরা এবং আমরা একই পর্যায়ের মুসলমান।

তাঁদের মন-মগজ, চিন্তা-ভাবনা, আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনের গতিধারা ছিল উর্ধ্বমুখী, আর আমাদের সবকিছুই নিম্নমুখী।

আমাদের মন-মগজের এ অবস্থা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে কতকগুলো কারণে। এ কারণগুলো পর্যায়ক্রমে ঘটে আসছে। আমরা ইতিহাসের কয়েকটা পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। সে পর্যায়গুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ প্রথম পর্যায়ে মুসলমানগণ ছিলেন দুর্দমনীয় সৌর্য-বীর্যের অধিকারী। তাঁরা নদীর স্রোত ও ঝড়ের গতি পরিবর্তন করে ফেলতেন। তাঁরা ইসলামের বিপরীত কোনো কিছুই বরদাস্ত করতেন না। তাঁদের মাথা শুধু আল্লাহর কাছেই নত হতো। দুনিয়ার কোনো শক্তির নিকট তাঁরা মাথা নত করেননি। তাঁরা প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় গোটা বিশ্বে ইসলামের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেছেন। এমনকি কোনো মহাসমুদ্রের মধ্যে এমন কোনো দ্বীপ ছিল না যেখানে মুসলমানগণ পৌঁছেননি। সেদিন যিনি মসজিদের ইমাম ছিলেন তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই ছিলেন সেনাপতি এবং তিনিই ছিলেন মুফতি। তখন মুসলমান কেউ যাকাত গ্রহণ করার মতো গরীব ছিল না। সবাই যাকাত দিতেন। সেদিন তাঁরা ছিলেন সারা দুনিয়ার শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ও শিক্ষা-দীক্ষায় এ জাতি ছিল সারাটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়। সেদিন এমন অবস্থা ছিল যে, যারাই মুসলমানদের অনুকরণ করতে পারতো তারা মনে করতো–'আমরা এবার সভ্যতার সিঁড়ি পেয়েছি।'

অতঃপর মুসলিম ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ মুসলিম শাসকরা খলিফার পরিবর্তে 'বাদশাহ' হয়ে পড়েন। তারা জিহাদের পরিবর্তে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইখলাসের পরিবর্তে স্বার্থপরতা ঢুকে পড়ে তাদের মধ্যে। কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে অলসতা

www.pathagar.com

ও বিলাসিতায় পেয়ে বসে মুসলিম শাসকবর্গকে। এ সময় রাষ্ট্রপ্রধান, মসজিদের ইমাম, সেনাপতি, মুফতি ইত্যাদি পদগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্রগুলো মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় । ইসলামী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা মুসলমানদের মগজে ঢুকতে থাকে। ইউরোপীয়-খ্রিস্টান এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে একটানা সংগ্রাম চলে প্রায় ২০০ বছর ধরে। পরে সংগ্রাম স্তিমিত হলেও শত্রুতা স্তিমিত হয় না। অতঃপর মুসলমানদের ব্রেন ওয়াশ শুরু হয় পুরা মাত্রায়। তাদের মগজে এমন ধারণা দেয়া হলো যে, ইসলামী ব্যবস্থাপনার চেয়ে পাশ্চাত্য খোদাহীন সমাজব্যবস্থাই উত্তম।

তৃতীয় পর্যায় ঃ এ পর্যায়ে একদিকে যেমন মুসলিম শাসকবর্গের বিলাসিতা ও নির্লিপ্ততার সুযোগ নিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের রাষ্ট্রগুলো কেড়ে নিতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে শুরু হয় অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাত। তখন খ্রিস্টানদের মনগড়া ধর্মমতকেই একমাত্র 'ধর্মমত' বলে তারা প্রচার করতে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যাচাই-বাছাইয়ে তা টেকে না। ফলে মনে করা হলো, প্রতিটি ধর্মমতই সম্ভবতঃ অবৈজ্ঞানিক। প্রকৃতপক্ষে 'ইসলাম' যে কি তা পর্দায় ঢাকা রইলো। শিক্ষিতদের অধিকাংশই মনে করলো, এখন পুরাতন যুগের ধর্মমতকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। এই সময় পর্যন্ত ইসলামের ধারক-বাহকগণ বিভিন্ন ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের সংঘাতে পড়ে দুর্বল হয়ে পড়েন ও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কারণে ইসলামকে খানকায়ী গণ্ডির মধ্যে গুটিয়ে আনা হয়। অতঃপর সৃষ্টির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুযায়ী যতই সমাজ থেকে ইসলামকে গুটাতে শুরু করা হলো ততই সমাজে জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকলো। আলো যেমন যতই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে, অন্ধকার ততই ঘোর থেকে ঘোরতর হতে থাকে। ঠিক তেমনি ইসলামের নূর যতই সমাজ থেকে বিদায় নিতে থাকে গণজীবনের দুর্ভোগের অন্ধকার ততই নেমে আসতে থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

অর্থাৎ 'ইসলামই শান্তির আলো আর গায়ের ইসলামই অশান্তির অন্ধকার।'

www.pathagar.com

মানুষ যখনই হোঁচট খায় তখনই বলে ওঠে 'ও আল্লাহ!' এটা আল্লাহর সৃষ্টি মানবপ্রবৃত্তির এক অলঙ্ঘনীয় ধারা। এই ধারা অনুযায়ী মানুষ যখনি চরম জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করতে থাকে তখনি 'ও আল্লাহ!' বলে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর সেই মুহূর্তেই আল্লাহ কোনো 'হাদী' পাঠান। এই কথাই আল্লাহ বলেছেন পবিত্র আল-কুরআনে–

وَمَا أَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ - اَلْأَعْرَافُ- ٩٤

অর্থ ঃ কোনো জনপদে চরম দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন দেখা দিলেই সেখানে নবী পাঠাই যেন সহজেই মানুষ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে চরম দুর্দশা থেকে বাঁচতে পারে। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৪৯)

আল্লাহর এই বিধান অনুযায়ী আগে যুগে যুগে নবী পাঠাতেন, আর আখেরী জমানায় আল্লাহ মুজাদ্দেদ পাঠান।

অতঃপর ইতিহাসের এই ধারা অনুযায়ী যখন (৩য় স্তরের শেষ পর্যায়ে) বিশ্বের জনগণ চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ে তখনই শুরু হয় ইসলামের প্রতি ঝোঁক।

চতুর্থ পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে শুরু হয় জোর ইসলামী আন্দোলন। অতঃপর কুচক্রীদের হাজারো বাধা-বিপত্তি ও ফতোয়াবাণে জর্জরিত হয়ে আন্দোলন সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে হারানো ইসলামী রাষ্ট্রগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের রূপ ধরে পুনরায় মুসলমানদের হাতে আসতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান আর তারই কারণে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ।

১৪শত বছর ধরে ইতিহাসের এসব পর্যায়গুলো পার হয়ে আসতে আসতে ইসলামের গায়ে কিছু ভিন্ন মতবাদের রং লেগে গেছে। ফলে এই যুগের মুসলমান আর ইসলামকে ইসলামের সঠিক রূপ-চেহারায় দেখতে পাচ্ছে না। আজকের ইসলামকে ইসলামের অনুসারী মানুষ দেখছে অন্ধের হাতি দেখার মতো।

www.pathagar.com

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আজ যদি আমরা ইসলামের সঠিক রূপ-চেহারা দুনিয়াকে দেখাতে পারতাম, তবে শুধু দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই নয় বরং রাষ্ট্রগুলোও মুসলমান হয়ে যেত। যেদিন মানুষ ইসলামকে তার সঠিক রূপ-চেহারায় দেখতে পেয়েছিল সেদিন দুনিয়ার প্রতিটি কোণ থেকেই মানুষ (ইসলামের উজ্জ্বল চেহারায় ও মুসলমানদের উন্নত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে) দলে দলে মুসলমান হয়েছিল। আর আজ?

আজ আমাদের চরিত্র দেখে অমুসলিম তো দূরের কথা, মুসলমানের ছেলেরাই মুসলমান থাকতে চাচ্ছে না।

আজ যদি ইসলামের সঠিক পরিচয় সমাজের সম্মুখে তুলে ধরতে পারতাম এবং মুসলমানদের চরিত্রে যদি ইসলাম বর্তমান থাকতো তবে আজও মানুষ দলে দলে মুসলমান হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতো এবং মুসলমানদের মাথায় কুড়াল মারলেও তারা সমাজতন্ত্রী বা ধর্মনিরপেক্ষবাদী হতো না।

সত্যি কথা বলতে কি, আজকের ইসলামকে কিছু নামধারী বুজর্গ ব্যক্তি নিজেদের পকেটজাত করে নিয়েছেন। তারা জ্ঞানের অগোচরে ইসলামের পোশাক পরে ইসলামের সঙ্গেই করছেন বিরোধিতা। অবশ্য তাদের বুঝমতো তারা এই যে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন তা তাঁরা ইখলাসের সঙ্গে নেক নিয়তেই করেন।

তারা মনে করেন, এ বিরোধিতায় খুব সওয়াব হচ্ছে। তাদেরকে অবশ্যই দু'বার লজ্জিত হতে হবে। একবার দুনিয়ায়, আর দ্বিতীয়বার পরকালে। যেমন পাকিস্তানে যেসব দ্বীনদার সুফি মুবাল্লিগগণ ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিলেন তারা যেমন লজ্জিত হচ্ছেন এটা দেখে যে, আমরা যাদেরকে ফতোয়াবাণে জর্জরিত করেছি তাদের দ্বারাই ইসলামী হুকুমাত কায়েম হলো অথচ আমাদের দ্বারা কিছুই হলো না বরং তারা এখন মনে মনে বুঝতেছেন যে, এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদি আমরা এ যাবৎ ফতোয়া না দিতাম তবে আরো সহজে ও আরো পূর্বেই এখানে ইসলাম কায়েম হতো। বাংলাদেশের ফতোয়াবাজদেরও একদিন তেমনি লজ্জিত হতে হবে।

ইসলামের প্রথম ফরয কাজ ছিল 'পড়া' আর প্রথম সুন্নাত ছিল 'চিন্তা-গবেষণা'। যেমন বিশ্বনবী (সা)-কে যেদিন প্রথম নবী হিসেবে

www.pathagar.com

পাওয়া গেল সেদিন তাঁকে হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তাই বলা চলে ঐ ধ্যান বা চিন্তা-গবেষণাই আমাদের জন্য প্রথম সুন্নাত। সেহেতু ইসলামের সঠিক চিত্র দেখতে হলে আল-কুরআন পড়তে হবে, রাসূল (সা) ও সাহাবীদের গোটা জীবন অধ্যয়ন করতে হবে এবং চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

ইসলামী আইন

ইসলামী আইন–যা শাসন ও বিচার বিভাগসহ জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্যই রচিত। তা যেহেতু আল্লাহর রচিত তাই তার মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি তো নেই-ই বরং তা হচ্ছে মানব জীবন তথা মানব সমাজের জন্য এক কল্যাণকর শ্রেষ্ঠতম আইন। মানুষের তৈরি আইন মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা লাগে। কারণ তার তৈরিটাই ভুল পন্থায়, আর আল্লাহর তৈরি আইন একবার–যা চালু করে দেয়া হয়েছে তা আর পরিবর্তন করা লাগে নাই। তাই আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَاتَبْدِيْلَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর আইন চির অপরিবর্তনীয়।'

যেমন অমাবস্যা-পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা, দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম এসবের যেমন কোনো পরিবর্তন নেই, তেমনি আল্লাহর তৈরি কোনো একটি আইনেরও কোনো পরিবর্তন নেই। আল্লাহ যেমন মহান তাঁর তৈরি আইনও তেমনি মহত্ত্বের অধিকারী। আর মানুষ যেহেতু ভুলত্রুটিতে পরিপূর্ণ তাই মানুষের তৈরি আইনও ভুলত্রুটিতে পরিপূর্ণ। এ সত্য দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো যত দ্রুত অনুধাবন করতে পারবে তত দ্রুত সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সংস্কৃতি

মানুষ যা করে তা-ই তার 'সংস্কৃতি'। মানুষ নাচ-গান করে, সুতরাং সেটাও একটা সংস্কৃতি। বলা হয়, ভৌগোলিক পরিবেশ সংস্কৃতির জন্মদাতা। কিন্তু আমার মতে ধর্মীয় বিশ্বাসই সংস্কৃতির জন্মদাতা। কারণ একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে মুসলমানরা ভুলেও কোনোদিন জল পান

www.pathagar.com

করে না, আর হিন্দুরা ভুলেও কোনোদিন পানি খেয়ে ফেলে না। মুসলমানদের পানির পিপাসা লাগে আর হিন্দুদের লাগে জলের তৃষ্ণা। আমরা যা করি তা আমাদের সংস্কৃতি, আর হিন্দুরা যা করে তা তাদের সংস্কৃতি। হিন্দুরা ধূতি পরে, তাদের মেয়েরা কপালে সিঁদুর লাগায়, এটা তাদের সংস্কৃতি। আর মুসলমানেরা লুঙ্গি পরে, টুপি মাথায় দেয়, এটা মুসলিম সংস্কৃতি।

কিন্তু যদি একই পরিবেশে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, মুচি-মেথর সবাই বাস করে তাহলে সংস্কৃতির কিছু আদান-প্রদান ঘটে বা দান-গ্রহণ হয়। যেমন আমরা হিন্দুদেরকে লুঙ্গি, পাজামা দান করেছি, তারা আমাদেরকে কাকা, মামা দান করেছে। নাচ-গান ও মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশাও তাদের দান।

খ্রিস্টানদের আমরা কিছুই দান করতে পারিনি, কিন্তু তারা আমাদেরকে কাঁটা চামচ, স্যুট-কোট, নেকটাই ইত্যাদি অনেক কিছু দান করেছে, আর দান করেছে উলঙ্গ সভ্যতা। আমরাও সেগুলো সানন্দে গ্রহণ করেছি।

ছোটকালে দেখেছি মেথরদের মেয়েরা নাভির নিচে শাড়ি পরতে আর পেট বেরিয়ে থাকা ব্লাউজ গায়ে দিতে। সেটা ছিল মেথরদের সংস্কৃতি। তারা সেটা আমাদের দান করেছে, আর আমরা তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছি। এভাবে দান গ্রহণের সিলসিলা জারিই রয়েছে আমাদের মধ্যে।

এ প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে আমার ছাত্রজীবনে কলকাতা থেকে একখানা পুরাতন সাইকেল কিনে এনেছিলাম। বিশ বছর পরেও আমি বলতাম–'এটা আমার সেই কলকাতা থেকে আনা সাইকেল।'

কিন্তু বিশ বছর পর হিসাব করে দেখলাম, যে পার্টসপত্রসহ সাইকেলটা এনেছিলাম এখন তার কিছুই নেই, সব পাল্টে ফেলেছি, আছে মাত্র ফ্রেমটা। তারও একটা রড ভেঙ্গে গিয়েছিল সেটাও পরিবর্তন করে নিয়েছিলাম। পূর্বের ছিল মাত্র উপরের রডটা বাদে ফ্রেমের বাকি অংশটুকু। কিন্তু সাইকেলের কথা কাউকে বলার সময় এমনভাবে বলতাম যে, যে পার্টসপত্রসহ এনেছিলাম এখনো যেন তাই রয়েছে।

এখন চিন্তা করি, আমার সেই কলকাতা থেকে আনা সাইকেলের অবস্থাও বিশ বছর পরে যা দাঁড়ালো, আরব থেকে আসা ইসলামের অবস্থাও

www.pathagar.com

যেন ১৪শত বছর পরে ঠিক তাই দাঁড়ালো। ১৪শত বছর ধরে সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আদর্শের দান-গ্রহণের সিলসিলা জারি রেখে ইসলামী আচরণের কিছুই আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মুসলমানদের চরিত্রে। শুধুমাত্র জোড়া-তালি দেয়া ফ্রেমটা ছাড়া বাদবাকি সবই আমরা পাল্টে ফেলেছি। এ প্রসঙ্গে একটা থিওরী আমাদের জেনে রাখা উচিত। তা হচ্ছে এই যে, 'কে দান করে আর কে তা গ্রহণ করে।'

দেখা যায়, যারা নিজেকে অঢেল সম্পদের মালিক মনে করে তারাই দান করে, আর যারা নিজেদেরকে সর্বহারা মনে করে তারাই দান গ্রহণ করে। এই স্বাভাবিক নিয়মকে সামনে রেখে বিচার করলে দেখা যায়, আমরা যেন মনে করি যে, আদর্শ, সভ্যতা, আইন-কানুন, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এর কিছুই আমাদের নিজস্ব নেই। তাই এসব ব্যাপারে আমরা অন্যের দ্বারস্থ হচ্ছি। যেমন বাংলাদেশে এমন বহু ছেলে আছে যারা দেখে যে, বাংলাদেশে অঢেল ধন-সম্পদ আছে, কিন্তু আমার পিতার কিছুই নেই।

ঠিক তেমনি আমরাও মনে করি এ বিশ্বে আদর্শ, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আইন-কানুন সব-ই আছে, কিন্তু আমাদের নিজস্ব কিছুই নেই। তাই আমরা বিদেশীদের নিকট হাত পাতি যে, দিবে কি তোমরা তোমাদের আদর্শ আমাদেরকে দান হিসেবে? দিবে কি একখানা লাল-নীল বই যা পড়ে জ্ঞান লাভ করবো। কারণ আমাদের নিজস্ব তো কিছুই নেই।

এটাই হচ্ছে আমাদের চিন্তাধারা। অথচ তার সবগুলোই আমাদের রয়েছে পূর্ণাঙ্গভাবে যা হচ্ছে সঠিক ও সমৃদ্ধশালী।

তাসাউফ ও রাজনীতি

তাসাউফ ঃ এক কথায় তাসাউফের সংজ্ঞা হচ্ছে–'আল্লাহপাক দুনিয়ার সমাজব্যবস্থা ও মানবের আমল-আখলাক যেভাবে দেখলে খুশি হন ঠিক সেইভাবেই মানব জাতির আমল-আখলাক ও পৃথিবীর সমাজব্যবস্থাকে গড়ে দেয়ার এবং আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের মধ্যেও প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি করা ও অন্যান্যদের মধ্যেও অনুরূপ ঝোঁক সৃষ্টি করা এবং নিজের বাস্তব জীবনে ও সমাজে তা বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেও আমরণ চেষ্টা করা ও অন্যান্যদের মধ্যেও অনুরূপ চেষ্টার প্রবণতা

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে দেয়া।' এ কাজের জন্য যেসব তরীকা অবলম্বন করা হয় সেগুলোই হচ্ছে প্রকৃত তাসাউফ শিক্ষার তরীকা।

রাজনীতি ঃ 'রাজনীতি' অর্থ 'রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি'। তাই ভিন্নার্থে এটাকে বলতে পারি 'নীতির রাজ'। ইসলামের একটা নিজস্ব নীতি রয়েছে যা দুনিয়ার সকল ধরনের নীতির রাজা। সুতরাং বলা চলে ইসলামের অপর নাম 'রাজনীতি'।

বিশ্বনবী (সা)-এর ২৩ বছরের নবুয়তী জিন্দেগীই ছিল ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে রক্ত ঝরানো জিহাদী রাজনীতির জিন্দেগী। রাজনীতি দুই ধরনের ঃ ১. মানুষের তৈরি এবং ২. আল্লাহর তৈরি।

মানুষের তৈরি রাজনীতি হচ্ছে সমাজে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে। সাইকেলের গিয়ার-চেইন যেমন সাইকেলের বাস্তব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তেমনি ইসলামের রাজনীতিই বাস্তব ইবাদতের উদ্দেশ্যে। যেমন চেইন ছাড়া সাইকের অচল, তেমনি রাজনীতি ছাড়া ইবাদত অচল। অর্থাৎ ইবাদতের জন্যই খেলাফত প্রয়োজন এবং খেলাফত লাভের জন্যই রাজনীতির প্রয়োজন।

উপসংহার

কোনো মেশিনের পার্টসপত্রগুলি যেমন প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি সম্পর্কযুক্ত তেমনি ইসলামী আইন-কানুনও প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকটি সম্পর্কযুক্ত। একটা পূর্ণাঙ্গ মেশিনের যেমন সব ধরনের পার্টসপত্র থাকতে হয় তেমনি একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার মধ্যেও তার নিজস্ব সকল ধরনের আইন-কানুন থাকা দরকার।

ইসলাম যেহেতু একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তাই এরও রয়েছে সকল আইন-কানুন। একটা মেশিনে যেমন অন্যকোনো মেশিনের পার্টসপত্র ফিট হয় না, যেমন সাইকেলে গরুর গাড়ির চাকা ফিট হয় না তেমনি ইসলামী জিন্দেগীতেও অন্যকোনো মতবাদের তৈরি আইন-কানুন ফিট হবে না।

কোনো মেশিনের যেমন কোনো পার্টসপত্র না থাকলে চলে না ঢিলাঢালাও চলে না, ঠিক তেমনি ইসলামেরও কোনো আইন-কানুন না থাকলে চলে না, ঢিলাঢালা হলেও চলে না।

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে খাওয়ার বেলায় যেমন হালাল-হারাম বেছে খেতে হয় তেমনি তাদের প্রত্যেকটি কাজের বেলায়ও হালাল-হারাম বেছে করতে হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের খাওয়া থেকে শুরু করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, চাষাবাদ, সমাজ-সামাজিকতা, বিয়ে-শাদি, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চা, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি, আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ এর প্রত্যেকটিই হতে হবে ইসলামী। এভাবে যদি জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগই ইসলাম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সেই জীবনই হয় পুরো ইসলামী জীবন।

তাই আসুন আমরা ইসলামী জীবন দর্শনকে সামনে রেখে তারই আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তুলি। এভাবেই প্রথমে ব্যক্তি, তারপর সমাজ, তারপর রাষ্ট্রকে ইসলামী জীবন দর্শনের ভিত্তিতে সাজিয়ে তুলি এবং দুনিয়াবাসীকে এর মহিমা বাস্তবে দেখিয়ে দিই। সাথে সাথে ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করি।

আল্লাহ্ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন! ❐

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০